মজলুম সাহাবি

সাহাবায়ে কেরামের দুঃখ-যাতনার ইতিকথা

রচনা
মাওলানা নুরুল হাসান বুখারি

অনুবাদ
সদরুল আমীন সাকিব

ইহদা
পাবলিকেশন

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আমাদের সুপথের জন্য সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় বিশাল নেয়ামত দান করেছেন। তার অজস্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদের প্রতি এবং তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠ মানবদলের প্রতি।

প্রিয় পাঠক, মুসলিম উম্মতের সর্বোত্তম আদর্শ সাহাবায়ে কেরামের জামাত। এই পুণ্যাত্মাগণ কেয়ামত অবধি হেদায়েতের পথে এক মহা নেয়ামত। তাদের মাধ্যমেই আমরা দ্বীনের সঠিক বর্ণনা পেয়েছি, তারাই আমাদের দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন, তারাই আমাদের আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হওয়ার পথ দেখিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের সাথে তাদের সেতুবন্ধন গড়ার পথটি কি এতটা সহজ ছিল? পিচঢালা পৃথিবীর ন্যায় সে পথ কি এতটা মসৃণ ছিল? মোটেই না! যখনই তারা কবুল করলেন খোদার দ্বীন, উঠে এলেন নবির পথে, তখনই দুনিয়ার সকল এবড়োখেবড়ো পথ এসে জড়ো হলো তাদের সামনে, বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল জিন-ইনসানের শয়তানি বাহিনী। তবে খোদার বিশেষ নির্বাচনে উত্তীর্ণ হওয়া এই শ্রেষ্ঠ মানবদল কোনো কণ্টকাকীর্ণতার বাধা মানলেন না, কোনো অপশক্তির পরোয়া করলেন না। খোদার রাহে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন নিজের প্রিয় জীবন, শখের সময় ও সম্পদ।

ইসলাম যখন নবজাতকের নির্মল হাসি নিয়ে দুনিয়ার বুকে নেমে আসে, তখন মক্কার মুশরিকদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস তার বিশুদ্ধ অক্সিজেন কেড়ে নিতে কোমর

বেঁধে নামে। তারা ইসলাম কবুলকারী সমাজের দুর্বল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি নিজেদের প্রাণপণ বিদ্বেষ উগড়ে দিতে শুরু করে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের কষ্ট-নির্যাতনের চূড়ান্তে পৌঁছে যায়। তবে শুধু দুর্বলদেরই নয়, বরং সমাজের গণ্যমান্য অনেক সাহাবি, এমনকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় সম্ভ্রান্ত মানুষকেও তারা নিপীড়নের মাধ্যমে নিচুতার সর্বোচ্চটা দেখিয়ে ছাড়ে!

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মূল শিরোনাম শুধু সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে হলেও তার সাথে আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলুমিয়তের বিবরণও কিছুটা বিস্তর আকারে তুলে ধরা হয়েছে; এতে একইসাথে পাঠকের নিকট জুলুমের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত উপস্থিত থাকবে। অবশ্য এখানে সকল মজলুম সাহাবির বিবরণ চলে আসার দাবি করা যায় না, বরং তার আংশিক বৃত্তান্ত এসেছেই বলা যায়। তবে এখানে নারী সাহাবিদের জুলুমের বিবরণ সচেতনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ, তার জন্য ইহদা পাবলিকেশন থেকে 'মজলুম নারী সাহাবি' নামে আমাদের স্বতন্ত্র একটি বই রয়েছে। তাই এখানে তথ্যের দ্বিরুক্তি করে কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনি। নারী সাহাবিদের প্রতি হওয়া জুলুম-অত্যাচার ও তাদের দুঃখ-কষ্ট জানতে 'মজলুম নারী সাহাবি' বইটি অবশ্যপাঠ্য।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে মুহতারাম লেখকের পাশাপাশি অনুবাদকের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন তথ্য সংকলন করা হয়েছে; কিছু স্থানে সংযোজন, বিয়োজন, সম্পাদনা ও আলোচনার স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। টীকায় গ্রন্থসূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে অনুবাদকের সংযোজিত তথ্য এবং কিছু স্থানে লেখকের গ্রন্থসূত্রের ক্ষেত্রে আমার সামনে থাকা পাণ্ডুলিপির খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে শেষে (*) স্টার চিহ্ন উলেখের মাধ্যমে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। সর্বোপরি বইটি পাঠকদের জন্য আরও বেশি তথ্যবহুল, উপকারী ও সাবলীল করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, তাই আমাদের কাজেও যেকোনো ধরনের অসঙ্গতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক; আর আমরা তা সংশোধন করে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রিয় পাঠক-পাঠিকার নিকট অনুরোধ থাকবে, যেকোনো ধরনের সংশোধনী বা পরামর্শ জানিয়ে আমাদের বাঁধিত করবেন।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ বইটি কবুল করুন, উম্মতের জন্য উপকারী করুন, লেখক-প্রকাশকসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষকে এর জন্য আখেরাতে পুরস্কৃত করুন। আমিন।

সদরুল আমীন সাকিব
০৭ এপ্রিল ২০২৫
sadrolaminsakib@gmail.com

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরামের মজলুমিয়ত ১৩
জুলুম-নির্যাতনই ছিল হিজরত ও জিহাদ বিধিত হওয়ার কারণ ১৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ ১৬
হিজরতের পথে মজলুম সাহাবিগণ ১৮
হাবশার দ্বিতীয় হিজরত ২১
মদিনার পথে হিজরত ২২
কুরআনে কারিমে হিজরতের আলোচনা ২৩
মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ২৬
গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর জুলুম-নির্যাতন ৩০
নির্যাতনের ধরন ৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ

রহমতে আলমের মজলুমিয়ত ৩২
৬. চাচা আবু লাহাব ও চাচি উম্মে জামিলের চরম দুশমনি ৩৬
১২. আবু জাহেলের কটূকথা ও হজরত হামজা রা.-এর ইসলাম গ্রহণ ৪১
১৩. আল্লাহর রাসুলকে আবু জাহেলের অপদস্থ করার পরিকল্পনা ৪৪

১৫. তায়েফে রহমতে আলমের ওপর পাথর নিক্ষেপ ৪৬
১৬. হত্যা পরিকল্পনা ও শিয়াবে আবু তালেব গিরিপথে অবরুদ্ধ জীবন ৪৭
১৭. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরাকে কষ্ট দেওয়া ৫০
১৮. মৌখিক নির্যাতন ৫১
২১. গালিগালাজ ৫৪
২২. বিদ্রুপ ও তিরস্কার ৫৪
২৩. কটাক্ষ করে নাম দেওয়া ৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবায়ে কেরামের মজলুমিয়ত ৫৬

প্রথম অনুচ্ছেদ

সমাজের দুর্বল শ্রেণির মজলুম সাহাবি ৬১
১. হজরত বেলাল ইবনে রাবাহ রা. ৬১
২. হজরত খাব্বাব ইবনে আরাত রা. ৬৪
৩. হজরত ইয়াসির ইবনে আমের রা. ৬৬
৪. হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ৬৮
৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসির রা. ৭১
৬. হজরত সুহাইব ইবনে সিনান রুমি রা. ৭১
৭. হজরত আবু ফুকাইহা রা. ৭৪
৮. হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা রা. ৭৫

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণির মজলুম সাহাবি ৭৭
৯. হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ৭৮
১০. হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. ৮৪
১১. হজরত উসমান ইবনে আফফান জুন্নুরাইন রা. ৯০
১২. হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ৯২
১৩. হজরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. ৯৩
১৪. হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. ৯৪

১৫. হজরত আমের ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. ৯৬
১৬. হজরত আবু জর গিফারি রা. ৯৭
১৭. হজরত খালেদ ইবনে সাইদ রা. ৯৮
১৮. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ১০১
১৯. হজরত সাইদ ইবনে যায়েদ রা. ১০৩
২০. হজরত উসমান ইবনে মাজউন রা. ১০৪
সাহাবায়ে কেরামের ইমান জাগানিয়া জীবন ১০৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মক্কায় বন্দিত্বের শিকার মজলুম সাহাবি ১০৮
২১. হজরত আইয়াশ ইবনে আবু রবিয়া রা. ১০৮
২২. হজরত সালামা ইবনে হিশাম রা. ১০৯
২৩. হজরত ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ১১০
তিন সাহাবি হত্যার পাঁয়তারা ১১২
২৪. হজরত মুসআব ইবনে উমাইর রা. ১১৩
২৫. হজরত হিশাম ইবনে আস রা. ১১৪
এক ইমান জাগানিয়া শিক্ষণীয় ঘটনা ১১৫
২৬-২৭. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল রা. ও হজরত আবু জানদাল ইবনে সুহাইল রা. ১১৮
২৮. হজরত আবু বাসির রা. ১২১
২৯. হজরত তুলাইব ইবনে উমাইর রা. ১২৩

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

বস্ত্রহীনতা, পানি বঞ্চনা ও অন্যান্য জুলুমের শিকার মজলুম সাহাবি ১২৫
৩০. হজরত আবদুল্লাহ মুযানি (জুল বিজাদাইন) রা. ১২৫
৩১. হজরত আবু উমামা বাহেলি রা. ১২৬
৩২. হজরত আবু রাফে রা. ১২৮
৩৩. হজরত উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফি রা. ১৩০
৩৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা সাহমি রা. ১৩২
অসমাপ্ত কাহিনি ১৩৪
খোদার নিকট মুনাজাত ১৩৪

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত বান্দা মহান নবি-রাসুলগণের প্রতি বর্ষিত হোক অগণিত রহমত ও সালাম।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইসলামের দাওয়াত ও তাবলিগ, হিজরত ও জিহাদের মতো আমলে যেভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরিক ছিলেন, তদ্রূপ আল্লাহর পথে অবস্থান করতে গিয়ে কাফেরদের পক্ষ থেকে কষ্ট-নির্যাতন ভোগ করার ক্ষেত্রেও তার সহযাত্রী ছিলেন।

বস্তুত মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রিসালাতের এই সূর্যসন্তানরাও যে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, মক্কার কাফের-মুশরিকদের হাতে অগ্নিপরীক্ষায় যেভাবে বেদনায় ছটফট করেছেন, যেভাবে একই সাথে ধূলিবালি ও রক্তে রঞ্জিত হয়েছেন, যেভাবে বর্শায় বিদ্ধ হয়েছেন এবং তিরের আঘাতে দেহে চালনির মতো অগণিত ক্ষত বয়ে বেড়িয়েছেন, সে কথা কল্পনা করতে গেলেও মানুষের গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে! এমনকি কিছু অসহায় সাহাবি তো জুলুম-নিপীড়নের জাঁতাকলে এতটাই পিষ্ট হয়েছিলেন যে, তা বরদাশত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন!

এবার জানতে চাচ্ছেন বুঝি কাফেরদের হাতে সেই অসহায়দের বন্দিত্বের যাতনা, পায়ে শিকল ও বেড়ির দাগ, ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট, গায়ের পোশাক খুলে নেওয়ার লজ্জা, মৌখিক কষ্ট ও গালমন্দের ন্যায় হাজার রকম নিপীড়নের কথা? সে কথা

আর কী বলার আছে বলুন! এসব তো ছিল কাফেরদের জন্য নস্যি। ইচ্ছে হলেই অবাধে ঝাঁপিয়ে পড়ত তীব্র আক্রোশে।

সারকথা, শুধু ইসলাম গ্রহণের অপরাধে(!) এবং আল্লাহকে একক প্রভু বলার দায়ে সাহাবায়ে কেরামকে যে নির্মম নিপীড়ন ও কঠোরতা সইতে হয়েছে, মানবেতিহাসে তার উপমা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এত সবের পরেও তাদের ইমান কতটা মজবুত ও আমাদের জন্য ইমান জাগানিয়া ছিল। একবার চিন্তা করুন, এত অগ্নিপরীক্ষা ও রক্তনদী পাড়ি দিয়েও তাদের মাঝে একজন মজলুমও নিজের ইমান থেকে সরে আসেননি, এবং রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর কুরাইশ কাফেরদের জল্লাদি ও নির্মমতা এই খোদাপ্রেমিক ও ইশকে নবির জামাত থেকে একজন সদস্যকেও আপন অবস্থান থেকে টলাতে পারেনি। বরং এসব মহাকাব্যের মহাপ্রেমিকদের কাছে এ সকল বিপদাপদ ও দুঃখ-মুসিবত যেন ঐশ্বরিক স্বাদ ও আনন্দেরই মনে হতো!

এ দুনিয়ার বুকে মজলুমের সংখ্যা কম নয়। মানুষের হাজার রকম জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তবে এই নির্যাতন-নিপীড়ন ও কঠোরতার মাঝেও যদি কেউ স্বাদ খুঁজে পেয়ে থাকে, তাহলে সেটা ওই রাসুলপ্রেমিকদের ভাগ্যেই জুটেছিল।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ওই শিহরণ জাগানিয়া দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-নির্যাতনের এক রক্তাক্ত আখ্যান, যে স্টিম রোলারে নিষ্পেষিত হয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠ মানবদল। কিন্তু ওই পবিত্রাত্মা পাগলপারার দল ইসলামের খাতিরে সকল দুঃখ-যাতনাই হাসিমুখে কবুল করে নিয়েছিলেন।

মূলত আমাদের এই ইসলাম সম্মানিত ওই মানুষদের মজলুমিয়ত ও কষ্ট-সহিষ্ণুতারই সুমিষ্ট ফল। গোটা মুসলিম উম্মতের পক্ষে কেয়ামত অবধি আশেকে রাসুলদের এই মহা অবদানের ঋণের কথা কখনোই ভোলা সম্ভব না। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্টির বারি বর্ষণ করুন।

মাওলানা নুরুল হাসান বুখারি

***

প্রথম অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরামের মজলুমিয়ত

সিরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাবলির বিশাল ভান্ডার সাহাবায়ে কেরামের ওপর পরিচালিত নির্মম নির্যাতনের বিবরণে ভরপুর রয়েছে। এর পাশাপাশি কুরআনে কারিমও এই নিপীড়িত শ্রেণিটির কথা বিশেষ আলোচনায় রেখেছে। বস্তুত সিরাতবিদ ও মুসলিম ঐতিহাসিকদের পূর্বে স্বয়ং মহাপ্রতিপালক আল্লাহ তায়ালাই তাদের নিপীড়িত হওয়ার বিবরণ ও রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ, রাসুল ও দ্বীনের প্রতি জান উৎসর্গকারী মহান সাহাবায়ে কেরামের ওপর পরিচালিত নির্যাতনের কথা কুরআনের বর্ণনায় লক্ষ করুন,

وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ

‘আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে অল্প (এবং নিজেদের) দেশে দুর্বল। তোমরা তখন ভয় করতে যে, পাছে লোকে তোমাদের অকস্মাৎ তুলে নিয়ে যায় নাকি!’[১]

আয়াতের ভাষা লক্ষ করুন—‘পাছে লোকে তোমাদের অকস্মাৎ তুলে নিয়ে যায় নাকি!’ প্রকৃতপক্ষে এই ভাষার ব্যবহার থেকে প্রাথমিক যুগের সাহাবায়ে কেরামের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও মজলুমিয়তের চিত্র প্রকাশ পায়। পাশাপাশি এখান থেকে খুব স্পষ্টভাবে এ চিত্রও কল্পনা করা যায় যে, আল্লাহর রাসুলের এই আশেকগণ মক্কার জমিনে কতটা মুসিবতের সাথে নিজেদের দিন পাড় করছিলেন।

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا

১. . সুরা আনফাল, আয়াত ২৬

‘(হে মুসলিম জাতি,) তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করো না আল্লাহর পথে এবং সেসব অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য, যারা (আল্লাহকে ডেকে) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যান, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী।’[২]

একবার চিন্তা করে দেখুন, মক্কার মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচার, জল্লাদপনা, রক্তপাত কি কখনো শেষ হতে পারে, যেখানে স্বয়ং কুরআন মাজিদই তাদেরকে জালেম নামে অভিহিত করেছে! ফলে তাদের নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে অবশেষে সাহাবায়ে কেরাম হিজরতের মতো কঠিন পথ বেছে নেন। কিন্তু মক্কাতে এমন অনেক দুর্বল অসহায় নরনারী ও বাচ্চাকাচ্চা রয়ে গিয়েছিল, যারা একেবারেই উপায় না থাকার কারণে মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত যেতে পারছিল না অথবা কাফেররা তাদেরকে জুলুম থেকে মুক্তির জন্য ছাড়তে রাজি হচ্ছিল না। কাফেররা পৈশাচিক মনের তৃপ্তি মেটাতে তাদের মতো অসহায় দুর্বল মুসলিমদের ওপর জুলুম চালাত। আর এই মজলুম বিপর্যস্ত সাহাবিরা হৃদয় উজাড় করে মহান রবের দরবারে কাকুতি জানাতেন, হে আমাদের প্রতিপালক, এই জালেমদের অত্যাচারের মুষ্টি থেকে আমাদের মুক্তির কোনো উপায় বের করে দিন।

অবশেষে মহান খোদা তাদের আকুল আবেদন কবুল করেন। ইতিমধ্যে যে সকল সাহাবি মদিনা তাইয়িবাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাদেরকে মক্কার মজলুম সাহাবিদের মুক্ত করে আনার জন্য জিহাদের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়।

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَ لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

‘যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হিজরত করেছে, নিশ্চয় আমি দুনিয়াতেও তাদের উত্তম নিবাস দান করব। আর আখারাতের প্রতিদান তো নিঃসন্দেহে অনেক বড়। হায় যদি তারা জানত!’[৩]

---

২. সুরা নিসা, আয়াত ৭৫

৩. সুরা নাহল, আয়াত ৪১

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ صَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘যারা নির্যাতিত হওয়া পর হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে ও অবিচল থেকেছে, নিশ্চয় এসব বিষয়ের পর আপনার প্রতিপালক (তাদের প্রতি) অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[৪]

জুলুম-নির্যাতনই ছিল হিজরত ও জিহাদ বিধিত হওয়ার কারণ

এ সকল আয়াত থেকে এ তত্ত্বও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের মূল কারণ ছিল তাদের ওপর চলা নির্মম জুলুম-নির্যাতন। মক্কার মুশরিকদের এই নিপীড়ন, জল্লাদপনা ও রক্তপিপাসার ধারা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন সাহাবিদের ওপর তাদের ক্রোধবিদ্বেষ, কঠোরতা আর কষ্ট ও শাস্তি প্রদানের সিলসিলা সীমা অতিক্রম করে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি আসে। তাই এ বিষয় একদম স্পষ্ট যে, পবিত্রাত্মা সাহাবায়ে কেরামের হিজরত ছিল নিতান্তই জুলুম-অত্যাচারের প্রতিষেধক হিসেবে।

তদ্রূপ জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণও ছিল তাদের ওপর চলা সেই নির্মম নিপীড়ন। আর এ নিপীড়নের একমাত্র কারণ বলে দেখানো হয়েছে যে, তারা শুধু মহান আল্লাহকেই নিজেদের রব বলে স্বীকার করত, অন্য কোনো উপাস্যকে তার সাথে শরিক করত না। এ ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনো অপরাধ(!) ছিল না। যেমন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ

‘যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করতে পূর্ণ সক্ষম। তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা বলত, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ...।’[৫]

৪. সুরা নাহল, আয়াত ১১০

৫. সুরা হজ, আয়াত ৩৯-৪০

হ্যাঁ, শুধু আল্লাহর একত্ববাদ ও তাওহিদের কথা উচ্চারণ আর তার প্রতি দাওয়াতের কারণেই মক্কার মুশরিকরা সাহাবায়ে কেরামের ওপর ক্রোধের উদ্গীরণ ঘটায় এবং ইতিহাসের বর্বরতম নিপীড়ন চালায়। এমনকি তার মাত্রা এতটাই সীমা ছাড়ায় যে, অবশেষে এই অসহায় মজলুম মানুষগুলো নিজেদের প্রিয় ঘরবাড়ি ও দেশ ছেড়ে দেশান্তর হতে বাধ্য হন। সে ধারায় মক্কা ছেড়ে তাদের প্রথমে হাবশায়, তারপর মদিনার পথে দেশ ছাড়তে হয়। কিন্তু দেশ থেকে বিতাড়ন করেও যখন মক্কার কাফেরদের মন ভরল না, বরং এখানেও তাদের শান্তির ঘুম হারাম করতে উঠেপড়ে লাগল এবং মদিনার ওপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো যে, ইসলাম ও মুসলিমদের সমূলে ধ্বংস করে দিতে হবে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জিহাদ ফরজ করা হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ

সাহাবায়ে কেরামের মজলুমিয়তের আলোচনার ভেতর দিয়ে এই বাস্তবতাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, প্রত্যেকজন মুহাজিরই অন্যায়ের শিকার হয়ে ও নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশান্তর হয়েছিলেন। যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, তাদের কোনো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ছিল, তাহলে তা একমাত্র এটাই যে, তারা ইমান ও ইসলামের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং শুধু এক আল্লাহর রুবুবিয়ত ও তাওহিদের ঘোষণা ও প্রচার করেছিলেন।

তাহলে সেসব লোক কতটা অপরাধী হতে পারে একবার চিন্তা করুন, যারা হজরত সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত মুহাজির সাহাবিদের পবিত্র ইমান-আমলে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা চালায় এবং তাদের নির্মল চরিত্রকে নিন্দা ও অভিযোগের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়ায়। হায় আফসোস! তারা যদি আল্লাহর কিতাবের প্রতি সত্যিই ইমান আনত, যেখানে সকল মুহাজির সাহাবির পবিত্র মনন, নির্মলতা, নির্লোভতা ও নির্দোষিতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে!

প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, মক্কার মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচারের ধারা শেষ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সাহাবিদের দুশমনশ্রেণির অবিচারের ধারা এখনো বহাল তবিয়তে আছে। আল্লাহ তায়ালা এই অন্যায়কারীদের হেদায়েত নসিব করুন। সারকথা, সাহাবায়ে কেরামের ওপর পরিচালিত জুলুমের

ধারাবাহিকতা এখনো ধারাবাহিক রয়েছে। এর নিরবচ্ছিন্নতায় কোনো ছেঁদ পড়েনি। মহান আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে তাদের যাবতীয় মজলুমিয়তের জন্য পরিপূর্ণ প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমিন। মহান আল্লাহ মজলুম সাহাবিদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়ে বলেন,

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

‘সুতরাং যারা হিজরত করেছে, যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, যারা আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং (দ্বীনের জন্য) যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের সকলের দোষত্রুটি মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে অবশ্যই এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। (তারা এসব লাভ করবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম প্রতিদান।’[৬]

পবিত্র কুরআনের জীবন্ত সাক্ষ্যের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, মহান মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম যত ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, তা একমাত্র আল্লাহর পথে দাঁড়ানোর জন্যই। আর সে কারণে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিনিময় ও প্রতিদানস্বরূপ তাদের অর্জিত হয়েছে জান্নাত। আল্লাহর সেই প্রতিদানই সর্বোত্তম ও সর্বোন্নত। অথচ সেসব মানুষের পক্ষ থেকে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর পথে নিজেদের জুলুম-নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট এবং ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার বিনিময় হিসেবে কেবল পেয়েছেন নিন্দা-তিরস্কার ও অভিযোগ-অপবাদের মালা। আহ, কত নিকৃষ্ট সেই প্রতিদান। কত নিকৃষ্ট সেসব প্রতিদানদাতা। আল্লাহ তাদের ভাগ্যে হেদায়েত নসিব করুন।

সারকথা, কুরআনের বহুবিধ আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের মজলুমিয়ত ও নিপীড়িত হওয়ার বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। বিশেষত উপরোল্লেখিত সুরা নাহলের ৪১ ও ১১০ নম্বর আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত থেকে এ

৬. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫

বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচারের পরেই হিজরতের ঘটনা ঘটে। যখন কুরাইশের নির্যাতন, জল্লাদপনা ও রক্তপিপাসা চূড়ান্তে পৌঁছে যায়, ওই সঙ্গিন মুহূর্তেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ আসে। নিম্নে হিজরত বিষয়ক কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হলো।

হিজরতের পথে মজলুম সাহাবিগণ

কুরাইশের কাফেররা যখন আল্লাহর প্রতি ইমান আনার কারণে দুর্বল অসহায় সাহাবায়ে কেরামের ওপর চূড়ান্ত নিপীড়ন চালানো শুরু করে এবং সুপ্রশস্ত মক্কাভূমি যখন মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত সংকীর্ণ অনুভূত হতে থাকে, তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খোদার প্রেমমগ্ন ও রিসালাতসূর্যের অনুসারীদের হাবশার পথে হিজরতের দিকনির্দেশনা দেন।

মূলত হিজরতের বিষয়ই এই বাস্তবতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, মক্কার রক্তপিপাসুদের পিপাসা ও নির্দয়তা ধৈর্যের বাঁধ ভাঙা পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। আর সে কারণেই ইসলামের প্রতি জান উৎসর্গকারীর একটি দল প্রিয় দেশ ও মাতৃভূমিকে 'ভালো থেকো' বলে বিদায় জানিয়ে ভিনদেশি হওয়ার মর্মযাতনা কবুল করে নিতে বাধ্য হন।

হাফেজুল হাদিস ইবনে আসাকির রহ. হজরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা করেন, মক্কা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের জন্য সংকুচিত হয়ে আসে, সীমাহীন কষ্ট ও শাস্তির সামনে যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হয়, দ্বীনের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে থাকেন, এদিকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে তাদের বাঁচানোর সাধ্যও ছিল না, তখন তিনি তাদের হাবশায় হিজরত করার আদেশ দেন।[৭]

ইমাম ইবনে সাদ রহ. ইমাম জুহরি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, যখন মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তারা ইমানের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, তখন অনেক মুশরিক নিজ গোত্রের ইমান আনয়নকারীদের ওপর হামলে পড়ে। তারা তাদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়, তাদের বন্দি করে রাখে এবং তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়।

---

৭. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৭২

এরই প্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হাবশায় হিজরত করার নির্দেশনা দেন। প্রথম হিজরতের সময় ১১জন পুরুষ ও ৪জন নারী অংশ নেন। এটা জানতে পেরে কুরাইশ কাফেররা সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত তাদের পিছু নেয়, কিন্তু সাহাবিরা ততক্ষণে জাহাজে উঠে চলে গিয়েছিলেন।[৮]

ইমাম ইবনে সাদ ও ইমাম ইবনে হিশাম রহ. এই ১৫জন মুহাজির সাহাবির বিস্তারিত তালিকা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে রয়েছে হজরত উসমান ইবনে আফফান রা. ও তার স্ত্রী আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হজরত রুকাইয়া রা.-এর নাম। পাশাপাশি আরও আছে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত উসমান ইবনে মাজউন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হজরত মুসআব ইবনে উমাইর প্রমুখের নাম।[৯] রাদিয়াল্লাহু আনহুম। ইমাম ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, তারপর হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব রা. হাবশার পথে হিজরত করেন। তার সাথে অন্য অনেক মুসলিমও হিজরতের পথ ধরেন।[১০]

মাওলানা শিবলি নোমানি রহ. লেখেন, সাধারণত ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, হিজরত শুধু সেসব মানুষই করেছিলেন, মক্কায় যাদের কোনো আশ্রয়দাতা ও হেফাজতকারী ছিল না। কিন্তু মুহাজির সাহাবিদের তালিকায় দেখা যায়, প্রত্যেক পর্যায়ের মানুষই সেখানে ছিলেন। মূলত এর ভিত্তিতে এ কথাই অধিক যৌক্তিক মনে হয়, কুরাইশের জুলুম-অবিচার শুধু অসহায় সাহাবিদের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বড় বড় গোত্রের অনেক সাহাবিও এই নিপীড়ন থেকে নিরাপদ ছিলেন না।

একটি আশ্চর্য বিষয় হলো, যেই সাহাবিদের ওপর সবচেয়ে বেশি জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়েছিল এবং যাদেরকে বলা যায় আগুনের বিছানায় শুইয়ে ঝলসে দেওয়া হয়েছিল—অর্থাৎ হজরত বেলাল, হজরত আম্মার, হজরত ইয়াসির ও অন্যান্য সাহাবি, সেই তাদের নামই হাবশার হিজরতের তালিকায় দেখা যায় না! এর কারণ হয়তো তারা এতটাই নিঃস্ব ছিলেন যে, এত বেশি নির্যাতন সত্ত্বেও তাদের পক্ষে দেশত্যাগের যাত্রার সামর্থ্য ও উপায় ছিল না। অথবা এটাও হতে

৮. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২০৩

৯. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২০৪

১০. সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/৩৪৫

পারে, তারা এই নিপীড়নের মধ্যেই খোদার পক্ষ থেকে বিশেষ মিষ্টতার স্বাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। ফলে এটা ছেড়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।[১১]

মাওলানা শিবলি নোমানি রহ. আরও লেখেন, বাদশা নাজাশির উদারতার বদৌলতে মুসলমানরা হাবশায় শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে থাকে। কুরাইশ কাফেরদের কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তারা ক্রোধোন্মত্ত ও অস্থির হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বাদশা নাজাশির কাছে দূত পাঠিয়ে অনুরোধ জানানো হবে, আমাদের দেশের অপরাধীদের আপনার দেশ হতে বহিষ্কার করে দিন। এ কাজের জন্য কাফের থাকাকালীন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবিয়া ও হজরত আমর ইবনে আছের ওপর দায়িত্ব অর্পন করা হয়। তারপর বাদশা নাজাশি ও তার দরবারের প্রতিজন উপদেষ্টার জন্য মূল্যবান ও দামি দামি উপহার প্রস্তুত করে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এই রাষ্ট্রীয় মিশন হাবশার পথে রওনা হয়।

মক্কার দূতরা হাবশা পৌঁছে বাদশার কাছে অনুরোধ জানায়, আপনি আমাদের দেশের অপরাধীদের আমাদের হাতে তুলে দিন। ওদিকে উপহার পেয়ে বাদশার উপদেষ্টারাও এ প্রস্তাবের পক্ষে সায় দেয়। কিন্তু বাদশা ব্যাপারটি যাচাই করার তাড়না অনুভব করেন। তাই তাৎক্ষণিক প্রস্তাব গ্রহণ না করে প্রথমে মুসলমান মুহাজিরদের রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চান।

বাদশার নির্দেশ পালনে হজরত জাফর রা. কথা বলেন এবং ইসলামি ইতিহাসের তাওহিদবাদী বিখ্যাত সেই ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, মহান রাজা, আমরা ছিলাম একটি মূর্খ জাতি। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত জন্তু খেতাম, ব্যভিচারে লিপ্ত হতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে মন্দ ব্যবহার করতাম, শক্তিশালীরা দুর্বলদের শোষণ করতাম। তারপর আমাদের মাঝে এমন একজনের আবির্ভাব ঘটে, যিনি আমাদেরকে ইসলামধর্মের প্রতি দাওয়াত প্রদান করেন। তখন আমরা তার ডাকে ইমান আনি, শিরিক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করি এবং সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসি। মূলত এই অপরাধেই(!) আমাদের জাতি আমাদের জানের দুশমনে পরিণত হয় এবং আমাদের বাধ্য করতে চায়, আমরা

---

১১. সিরাতুন নবি, ১/২১৯-২২০

যেন আবারও পূর্বের ভ্রষ্টপথে প্রত্যাবর্তন করি। এভাবে হজরত জাফর রা. আরও বিস্তারিতভাবে ইসলামের শিক্ষা-চরিত্রের কথা বাদশার কাছে খুলে বলেন।

এদিকে হজরত জাফরের ভাষণে বাদশা প্রভাবিত হন এবং বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই তিনি কুরাইশ দূতদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, তোমরা ফিরে যাও, আমি কখনোই এই নির্যাতিতদের তোমাদের হাতে সোপর্দ করব না।

ঘটনাটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি সিরাতে ইবনে হিশামেও এর বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।[১২]

সিরাতে ইবনে হিশাম গ্রন্থের বর্ণনায় হজরত জাফর রা. নিম্নোক্ত ভাষায় কুরাইশের জুলুমের বিবরণ দিয়েছিলেন যে, তারা যখন আমাদের ওপর কঠোর আচরণ, জুলুম ও আমাদেরকে কোণঠাসা করতে শুরু করল এবং আমাদের দ্বীন পালনের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল, তখন আমরা আপনার দেশে (আশ্রয়ের জন্য চলে) এলাম।[১৩]

সিরাতুন নবি গ্রন্থে লেখা হয়েছে, প্রায় ৮৩জন মুসলমান হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে কিছু দিন শান্তিতে অবস্থানের পর হঠাৎ তাদের কাছে (গুজবভিত্তিক) এক সংবাদ আসে, মক্কার মুশরিকরা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে। এ খবর শুনে অধিকাংশ মুহাজির মক্কার পথ ধরেন। কিন্তু মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে বুঝতে পারেন, সংবাদটি ভিত্তিহীন ছিল। ফলে কিছু মুসলমান আবারও ফিরে চলে যান, আর অধিকাংশ মানুষ গোপনে মক্কায় প্রবেশ করেন।[১৪]

হাবশার দ্বিতীয় হিজরত

যে সকল মুসলিম হাবশা থেকে ফিরে আসেন, এবার তাদের ওপর মুশরিকরা আরও বেশি অত্যাচার শুরু করে। এত বেশি নিপীড়নে জর্জরিত করে ফেলে যে, তারা আবারও হিজরত করতে বাধ্য হন। কিন্তু এবার হিজরতের জন্য মক্কা থেকে বের হওয়া এত সহজ ছিল না। কাফেররা তাদের ওপর কঠিনভাবে বাধা আরোপ

১২. সিরাতুন নবি, ১/২২০-২২২ (ঈষৎ সংক্ষেপিত)।

১৩. সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/৩৬০

১৪. সিরাতুন নবি, ১/২২৩

করে রেখেছিল। তবুও যেকোনোভাবেই হোক অনেক সাহাবি মক্কা ত্যাগ করে আবারও হাবশায় পৌঁছতে সক্ষম হন। সংখ্যায় তারা ছিলেন প্রায় ১০০জন।[১৫]

ইমাম ইবনে সাদ রহ. বর্ণনা করেন, যখন সাহাবায়ে কেরাম প্রথমবার হিজরতের পর মক্কায় ফিরে আসেন, তখন তাদের ওপর গোত্রের লোকেরা চরম পর্যায়ের নির্যাতন শুরু করে এবং জুলুম-অত্যাচারে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলে। ফলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেন। মূলত এই দ্বিতীয় হিজরত ছিল প্রথম হিজরতের তুলনায় আরও বেশি কষ্টের কারণে। তারা কুরাইশের পক্ষ থেকে মারাত্মক কঠোর আচরণ ও নির্মম নির্যাতন ভোগ করেন। বাদশা নাজাশি মুসলিমদের সাথে কোমল আচরণ করেছেন, সে কারণে মুশরিকদের বিদ্বেষ-জিঘাংসার পারদ চরমে পৌঁছে গিয়েছিল।[১৬]

ইমাম ইবনে সাদ রহ. লেখেন, এই হিজরতে ৮৩জন পুরুষ ও ১১জন কুরাইশি মুসলমান নারী আর ৭জন অকুরাইশি মুসলমান নারী অংশ নেন।[১৭] সর্বমোট ১০১জন মুসলমান হিজরত করেন।

মদিনার পথে হিজরত

ইমাম ইবনে সাদ রহ. লেখেন, যখন মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের ওপর কঠিনতর নির্যাতন নেমে আসে, তারা সাহাবায়ে কেরামের জীবন ওষ্ঠাগত করে দেয়, তাদেরকে চরমভাবে অপমান-অপদস্থ করতে থাকে এবং এমনভাবে মৌখিক ও দৈহিক কষ্ট দিতে শুরু করে, যেমনটা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানান। প্রত্যুত্তরে তিনি তাদের ইয়াছরিব তথা মদিনায় হিজরতের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী তারা হিজরত শুরু করে দেন।[১৮]

---

১৫. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২০৭

১৬. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২০৭

১৭. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২০৭

১৮. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২২৬

মজলুম নারী সাহাবি

নারী সাহাবিদের দুঃখ-যাতনার ইতিকথা

রচনা
ড. হাফেজ মুহাম্মাদ শাহবাজ হাসান

অনুবাদ
সদরুল আমীন সাকিব

ইহদা
পাবলিকেশন

উৎসর্গ

একত্ববাদী দৃঢ়বিশ্বাসী মুসলিম নারীকুলের প্রতি—
বিবিধ নির্যাতনের মুখে অটল যারা,
সত্য ও ন্যায়ের আঁচল কখনো ছাড়েনি যারা,
ইসলামের বুকে নিজেদের দৃঢ়তার পতাকা গেড়েছে যারা,
দুনিয়া উৎসর্গ করে নিজেদের আখেরাত অর্জন করেছে যারা,
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সাহস ও সংকল্পের ইতিহাস রচয়িতা যারা,
নৈরাশ্যের ঘনঘোর আকাশে উজ্জ্বল সূর্যের কিরণ হয়ে আছে যারা।

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহামহিম আল্লাহর জন্য, যার স্তুতি গাইতে আমরা অক্ষম। রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন জগতের জন্য রহমত হয়ে।

মানুষ অনুসরণপ্রিয়। অনুসরণে সে আস্থা পায়, সান্ত্বনা পায়। জীবনের নানা দিক জটিলতার মহাবিশ্ব। তাই আমরা পথচলার মাঝে কোনো অতীত উদাহরণ খুঁজে বেড়াই। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের জন্য সে পথ মসৃণ করেছেন, দান করেছেন সাহাবি নামক এক বাতিঘর।

সাহাবায়ে কেরাম মুমিন জীবনের আদর্শ। তাদের আমরা ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, তাদের দুঃখবেদনায় সমব্যথী হই। তাদের আমরা জান্নাতে গমনের জন্য সিরাতুল মুস্তাকিমের পথপ্রদর্শক মনে করি। ইহজগতের সকল দিকের ন্যায় মানবজীবনের দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-নিপীড়নের ক্ষেত্রেও তারা আমাদের উত্তম আদর্শ বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষত মুসলমান নারীসমাজের জন্য নারী সাহাবিগণ পূর্ণ আদর্শ হয়ে তাদের পথ দেখাচ্ছেন।

অতএব বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সম্মানিত লেখক এমন কতিপয় নারী সাহাবির বিবরণ উল্লেখ করেছেন, যাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-নিপীড়নের অধ্যায়টি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আলোচনাকে জীবনঘনিষ্ঠ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তাই এখানে শুধু কাফের-মুশরিকদের হাতে নির্যাতিতা নারী সাহাবিদের আলোচনা সীমিত না করে জীবনের নানা দিককেন্দ্রিক দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনার শিকার নারীদের কথা উল্লেখের মাধ্যমে রচনাটিকে যথাসম্ভব বাস্তবসম্মতকরণের চেষ্টা করা

হয়েছে। যেন শ্রেণি নির্বিশেষে সকল নারীই নিজের জন্য কোনো অনুসরণীয় জনের দেখা পান, সান্ত্বনা ও আদর্শের বাণী খুঁজে পান।

এমন একটি বই অনুবাদ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। সাহাবায়ে কেরামের সাথে পাঠকের সেতুবন্ধন হতে পেরে অবর্ণনীয় ভালো লাগা কাজ করছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তা যথাসম্ভব সহজ-সাবলীল করার চেষ্টা করেছি। লেখকের তথ্য-উপস্থাপনার মাঝে পাঠক-উপযোগী প্রয়োজনীয় সম্পাদনার মাধ্যমে রচনাটি আরও বেশি সুন্দর, উপকারী করার উদ্যোগ রেখেছি। তবে মানবকর্ম ভুলের ধর্ম। অতএব সম্মানিত পাঠকের নিকট আরজি থাকবে, যেকোনো ভুল, অসঙ্গতি, পরামর্শ থাকলে তা জানিয়ে বাধিত করবেন। আমরা আন্তরিকভাবে বিবেচনা করব।

আল্লাহ বইটিতে বরকত দান করুন। লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একে ইহ-পরলোকে উপকারের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন।

সদরুল আমীন সাকিব
নেত্রকোণা সদর
২৬.০২.২০২৪
sadrolaminsakib@gmail.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন যুগে নারীর প্রতি জুলুম

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুলুম-নির্যাতনের হারামত্ব ও ভয়াবহতা ১৯
মজলুমের বদদুআ থেকে বাঁচো! ২১
জুলুম করো না ২৪
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক কাফেরের অঙ্গীকার রক্ষা ২৬
আমার হাত অবশ হয়ে যাক, যদি আমি জয়নবকে মারি ২৬
লাঠিওয়ালা পুরুষ ৩০
আদেশ নয়, পরামর্শ ৩১
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীনকালে মুমিন নারীর ওপর জুলুম ৩৭
এক কাফের ফাসেকের অপচেষ্টা ৩৭
ব্যভিচারী ঘাতক ৩৯
জিল আওতাদ (পেরেকওয়ালা) ফেরাউন ৪০
সবর করুন আম্মাজান, আপনি সত্যের ওপর আছেন ৪১
তুমি খুবই ভয়ানক কাজ করেছ ৪১

কূপের ভেতর ফেলে পিতার হাতে কন্যা হত্যা ৪৩
আল্লাহর হাতে নিহতের রক্ত মূল্যহীন ৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারী সাহাবিদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের কুরআনি প্রমাণ ৪৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নারী সাহাবিদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের ঐতিহাসিক প্রমাণ ৫৩
কেন আপনি আমাদের সাহায্যের জন্য দুআ করেন না? ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দৈহিক নির্যাতনের শিকার নারী সাহাবি

আসমা বিনতে আবু বকর রা. ৫৭
আসমা বিনতে সালামা রা. ৬০
আম্মাজান উম্মে হাবিবা রা. ৬১
উম্মে শারিক দাওসিয়া রা. ৬৪
উম্মে উবাইস রা. ৬৫
উম্মে আফিফ রা. ৬৬
শহিদা উম্মে ওয়ারাকা আনসারিয়া রা. ৬৬
জারিয়া (বিনতে আমর) রা. ৬৭
হাবিবা বিনতে সাহল রা. ৬৭
হামামা রা. ৬৮
হাওয়া আনসারিয়া রা. ৬৯
যিন্নিরা রুমিয়া রা. ৬৯
জয়নব রা. ৭০
ইসলামের প্রথম শহিদ সুমাইয়া বিনতে খুব্বাত রা. ৭২
ফাতেমা জাহরা রা. ৭৩
লাবিবা রা. ৭৮
লায়লা বিনতে আবু হাছমা রা. ৭৯
নাহদিয়া রা. ৮০

তৃতীয় অধ্যায়

দেহব্যবসায় বাধ্যকরণ, মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং অর্থনৈতিক ও আধিকারিক জুলুমের শিকার নারী সাহাবি

প্রথম পরিচ্ছেদে

দেহব্যবসায় জবরদস্তি ও যৌন নিপীড়নের শিকার নারী সাহাবি ৮২
উমাইমা রা. ৮৪
মুসসাইকা রা. ৮৬
মুয়াজা বিনতে আবদুল্লাহ রা. ৮৬
এক মুসলিম নারীকে অসম্মানের পরিণতি ৮৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অপবাদ আরোপিত নারী সাহাবি ৯১
উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. ৯২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক ও আধিকারিক জুলুমের শিকার নারী সাহাবি ১০৩
উম্মে কুজ্জা আনসারিয়া রা. ১০৩
কুবাইশা বিনতে মান আনসারিয়া রা. ১০৫
সাদ ইবনে রবি রা.-এর কন্যা ১০৬
জামিল বিনতে ইয়াসার মুজানিয়া রা. ১০৭
খানসা বিনতে হিজাম আনসারি রা. ১০৭

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদে

আপনজন বঞ্চিত নারী সাহাবি ১১০
উমামা বিনতে আবুল আস রা. ১১০
আম্মাজান উম্মে সালামা রা. ১১১
ফুরাইয়া খুদরিয়া আনসারিয়া রা. ১১৬
উম্মে ইসহাক গানাবিয়া রা. ১১৮

খানসা তামাদুর রা. ১১৯
জয়নব বিনতে আলি রা. ১২০
আসমা বিনতে উমাইস রা. ১২১
খুলাইদা বিনতে কায়েস রা. ১২৪
জয়নব বিনতে আবু সালামা রা. ১২৫
উম্মে কুলসুম বিনতে আলি রা. ১২৭
আম্মাজান হজরত হাফসা রা. ১৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিশোধমূলক তালাক ও জিহারের শিকার নারী সাহাবি ১৩৭
উম্মে কুলসুম রা. ১৩৭
খাওলা বিনতে ছালাবা খাজরাজি আনসারি রা. ১৩৮
হজরত রুকাইয়া রা. ১৪১

ভূমিকা

সকল কিছুর জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি, একমাত্র যার দয়া ও তাওফিকেই আমাদের যাবতীয় পুণ্যকর্ম পূর্ণতা লাভ করে। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তার পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও সকল মুমিন-মুসলমানের প্রতি।

অনেক হাদিসগ্রন্থ ও আসমায়ে রিজাল (চরিতশাস্ত্র) বিষয়ক সকল গ্রন্থেই নারী সাহাবিদের জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে। যেমন : মুহাম্মাদ ইবনে সাদ রহ. (২৩০ হি.), ইবনে মানদাহ রহ. (৩৯৫ হি.), আবু নুয়াইম রহ. (৪০৩ হি.), কাজি ইবনে আবদুল বার রহ. (৪৬৩ হি.), আবু মুসা ইসপাহানি রহ. (৫৮১ হি.), ইবনুল আসির জাযারি রহ. (৬৩০ হি.), শামসুদ্দিন যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.), ইবনে হাজার আসকালানি রহ. (৮৫২ হি.) প্রমুখ চরিতকারের গ্রন্থে নারী সাহাবিদের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

কাজি ইবনে আবদুল বার রহ. সাহাবিদের জীবনচরিত বিষয়ে 'আল-ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব' নামক বৃহৎ কলেবরের এক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর একটি অংশে তিনি 'কিতাবুন নিসা ওয়া কুনাহুন্না' (নারী ও উপনামে পরিচিত নারীদের অধ্যায়) শিরোনামের অধীনে আরবি অক্ষরক্রমিক বিন্যাসে একে একে ৩৯৮ জন নারী সাহাবির জীবনী আলোচনা করেছেন। তাদের মাঝে যারা নামে প্রসিদ্ধ তাদের নামের মাধ্যমে, আর যারা উপনামে প্রসিদ্ধ তাদের উপনামের মাধ্যমে আলোচনায় স্থান দিয়েছেন।

জীবনচরিত বিষয়ক আরেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো মুহাম্মাদ ইবনে সাদ রহ. রচিত 'তবাকাতুল কুবরা'। যার আট নম্বর খণ্ডটি শুধু নারী সাহাবি ও মুসলিম নেককার নারীদের জীবনীর আলোচনায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থটি উর্দু অনুবাদে 'তবাকাতে ইবনে সাদ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মোট ৬২৭ জন নারী সাহাবির জীবনী এসেছে। সে অংশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদি, নানি, সম্মানিত মাতা, তার পবিত্রাত্মা স্ত্রী এবং তার চার কন্যাসহ অনেক নারী সাহাবির জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : ক্রমান্বয়ে আলোচিত হয়েছেন হজরত খাদিজা রা., নবিকন্যারা, নবিজির ফুফি ও তাদের মেয়ে সন্তানরা, উম্মাহাতুল মুমিনিনগণ, তারপর কুরাইশ গোত্রের নারী ও সাধারণ মুহাজির নারীরা, তারপর আনসার নারীরা। প্রত্যেকে তাদের গোত্রভিত্তিক আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছেন।

আল্লামা ইবনে আসির জাযারি রহ.-ও জীবনচরিত বিষয়ে 'উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবাহ' নামে এক বড় পরিসরের গ্রন্থ লিখেছেন। যার পুরো একটি খণ্ডজুড়ে শুধু নারী সাহাবিদের আলোচনা এসেছে। এখানেও প্রথমে মূল নাম ও তারপর উপনামে প্রসিদ্ধির ব্যাপারটি লক্ষ রেখে অক্ষরক্রমিক বিন্যাসে নারী সাহাবিদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতে মোট ১০২২ জন সাহাবিয়ার জীবনী উঠে এসেছে।

হাফেজুল হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-ও আসমাউর রিজাল বিষয়ে 'আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ' নামে বিশাল কলেবরের গ্রন্থনা সম্পন্ন করেছেন। যার শেষ খণ্ডটি 'কিতাবুন নিসা' (নারী অধ্যায়) শীর্ষক শিরানামে নারীদের আলোচনায় পরিপূর্ণ। এতে পুনরাবৃত্তি ও উপনামের উল্লেখসহ মোট ১৫৪৫ জন সাহাবিয়ার আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্য কোনো গ্রন্থেই এত বেশি নারী সাহাবির নাম আলোচিত হয়নি। গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদও রয়েছে।

একই বিষয়ে ইবনে হাজার আসকালানির অন্য একটি গ্রন্থ হলো 'তাহজিবুত তাহজিব'। যার মধ্যে তিনি কতিপয় নারী তাবেয়ি ও সাহাবিয়ার পুনরাবৃত্তিসহ মোট ৩২২ জন নারী সাহাবির জীবনী আলোচনা করেছেন।

ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি রহ.-ও তার সুবিশাল 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থের প্রথম তিন খণ্ডের ভেতরে বিস্তারিতভাবে কতিপয় নারী সাহাবির আলোচনা করেছেন।

বস্তুত নারী সাহাবিদের জীবনীগ্রন্থ রচনার ধারা এখনো চলমান। যেমন 'সাহাবিয়্যাত' নামে উর্দু ভাষায় রচিত আল্লামা নিয়াজ ফাতাহপুরির গ্রন্থ। তদ্রূপ সায়িদ আনসারির 'সিয়ারুস সাহাবিয়্যাত', আবদুস সালাম নদবির 'উসওয়ায়ে সাহাবিয়্যাত', যেখানে বিবিধ শিরোনামে তাদের জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে। আরব আলেমগণও এ বিষয়ে বহু চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার মাঝে উর্দু ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাবলির মাঝে রয়েছে আবু আম্মার মাহমুদ মিসরির রচিত 'সাহাবিয়্যাতুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' (গুলশানে রিসালাত কি মাহাকতি কলিয়া নামে), আহমাদ খলিল জুমআর রচিত 'সাহাবিয়্যাতুন তায়্যিবাতুন', আবদুল্লাহ বাদরানের লিখিত 'সিরাতুল মুমিনাত' ইত্যাদি।

তা ছাড়া সামষ্টিক ধারার পাশাপাশি নির্ধারিত সাহাবিয়াদের জীবনী রচনার ধারাও গতিশীল। যেমন রয়েছে আহমাদ খলিল জুমআ রচিত 'নিসাউ আহলিল বাইত' ('খাওয়াতিনে আহলে বাইত' উর্দু অনূদিত নাম), মাওলানা মাহমুদ আহমাদ গাদানফার রচিত 'সাহাবিয়্যাতে মুবাশশারাত' । গাদানফার সাহেব সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত বিষয়ে অনেক আরবি গ্রন্থেরই উর্দু অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। এ ধারায় হায়াতে 'সাহাবিয়্যাত কে দুরাখশাঁ পহলো' নামেও একটি গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা নারী সাহাবিদের জীবনের শুধু একটি দিক নিয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। মূলত বিষয়ের দিকে লক্ষ করলে এ বিষয়ে এটাই প্রথম গ্রন্থ, যেখানে শুধু তাদের প্রতি হওয়া জুলুম-অত্যাচার ও তাদের জীবনের দুঃখ-যাতনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বস্তুত নিয়মতান্ত্রিক নির্মম অত্যাচার ছাড়াও জীবনে তারা আরও অনেক ধরনের জুলুমের শিকার হয়েছেন; বিশেষত দুর্বল শ্রেণির নারীদের বিশেষভাবে টার্গেট করা হতো। মোটাদাগে নারীদের হক ছিনিয়ে নেওয়া, যৌন হয়রানি করা, শারীরিক কষ্ট দেওয়া, মানসিক নিপীড়নের শিকার বানানো, তাদের ধনসম্পদের ওপর অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো।

অতএব বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ অবলা নারীজাতির জন্য সাহাবিয়াদের জীবনাদর্শের আলোকে পথনির্দেশক হবে। পাশাপাশি নির্যাতন, সীমালঙ্ঘনের শিকার নারীদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে আশা করছি। তা ছাড়া আমি মজলুম সাহাবিয়াদের জীবনবৃত্তান্ত সামনে রেখে বর্তমান নারীদের ওপর হওয়া জুলুম-নির্যাতনেরও পথরোধ করা যেতে পারে বলে মনে করি।

আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থকে রচয়িতার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন এবং সম্মানিত পাঠকদেরও এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

ড. হাফেজ মুহাম্মাদ শাহবাজ হাসান
এসোসিয়েট প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, লাহোর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুলুম-নির্যাতনের হারামত্ব ও ভয়াবহতা

কুরআন মাজিদের বিশটি আয়াত এবং হাদিসে নববির প্রচুর বর্ণনায় জুলুম-অত্যাচারকে নিষেধ করা হয়েছে, এর প্রতি তিরস্কার বিবৃত হয়েছে, এমনকি জুলুমের যত প্রকার ও ধরন হতে পারে, সবগুলোকেই একবাক্যে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অনেক আয়াত ও হাদিসে জুলুমের কী ভয়াবহ পরিণতি হবে, সে কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ

> ‘জালেমদের জন্য কোনো বন্ধু কিংবা গ্রাহ্য করার মতো কোনো সুপারিশকারী পাওয়া যাবে না।’[১]

অন্য এক আয়াতে তিনি জানান,

وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

> ‘আর জালেমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কোন পরিণতির দিকে ওরা প্রত্যাবর্তন করছে![২]

১. সুরা মুমিন, ১৮

২. সুরা শুআরা, ২২৭

তদ্রূপ হাদিস শরিফে হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

> ‘তোমরা জুলুম থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কেয়ামতের মাঠে জুলুমসমূহ অন্ধকারের রূপে আবির্ভূত হবে।’[৩]

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

> ‘কেয়ামতের দিন অবশ্যই হকদারদের হকগুলো আদায় করা হবে। এমনকি শিংওয়ালা বকরি থেকে শিংহীন বকরির প্রতিশোধও আদায় করা হবে।’[৪]

এমনকি কিছু হাদিস থেকে এ কথাও জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন জালেমদের আমলনামায় যদি কিছু নেক আমল পাওয়া যায়, তাহলে সেগুলো তাদের হাতে জুলুমের শিকার মজলুমদের আমলনামায় দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি কোনো নেক আমল না থাকে, তাহলে মজলুমদের বদআমলগুলো ওই জালেমদের আমলনামায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।[৫] যেমন হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জানো, দেওলিয়া কোন ব্যক্তি? লোকজন বলল, আমরা দেওলিয়া বলে থাকি ওই লোককে, যার কাছে না আছে কোনো দিরহাম (অর্থ), আর না আছে কোনো জিনিসপত্র। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের মাঝে দেওলিয়া হলো ওই ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, জাকাতের আমলগুলো নিয়ে উপস্থিত হবে, (কিন্তু তার সাথে সে এ বিষয়গুলো নিয়েও উপস্থিত হবে যে,) অমুককে সে গালি

---

৩. সহিহ মুসলিম, ২৫৭৮

৪. প্রাগুক্ত, ২৫৮২

৫. সহিহ বুখারি, ২৪৪৯

দিয়েছিল, অমুককে সে অপবাদ দিয়েছিল, অমুকের সম্পদ সে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছিল, অমুকের রক্ত ঝড়িয়েছিল, অমুককে আঘাত করেছিল। এমতাবস্থায় তার নেকিগুলো তার হাতে জুলুমের শিকার মানুষদের দিয়ে দেওয়া হবে। তখন যদি অন্যদের হক আদায়ের পূর্বেই তার নেকির পরিমাণ শেষ হয়ে যায়, তাহলে মজলুমদের গুনাহগুলো নিয়ে ওই জালেমের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে।[৬]

হজরত আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ জালেমকে ছাড় দিয়ে রাখেন, কিন্তু যখন ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۭ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

‘আপনার রবের ধরা এমনই হয়, যখন তিনি জুলুমে লিপ্ত জনপদগুলোকে পাকড়াও করেন! নিশ্চয় তার পাকড়াও অতি মর্মন্তুদ, অতি কঠিন।’[৭]

মজলুমের বদদুআ থেকে বাঁচো!

মানুষের ওপর জুলুম করবেন না। কারণ, যদি এই জুলুমের কারণে মজলুম ব্যক্তি বদদুআ দিয়ে বসে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা কবুল হয়ে যায়। যেমন হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-কে যখন ইয়ামেনের প্রশাসক হিসেবে প্রেরণ করা হচ্ছিল, তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনেক উপদেশ দেন। তন্মধ্যে একটি উপদেশ ছিল মজলুমের বদদুআ থেকে বেঁচে থেকো। কারণ, আল্লাহ ও সেই দুআর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক নেই।[৮]

বস্তুত ইতিহাসে জালেমের বিরুদ্ধে বদদুআ কবুলের অগণিত উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে আমরা কেবল দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

এক.

উমর ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতা মুহাম্মাদ থেকে সাহাবি সায়িদ ইবনে জায়েদ রা.-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার আরওয়া নামক এক নারী সায়িদের

৬. সহিহ মুসলিম, ২৫৮১

৭. সুরা হুদ, ১০২; সহিহ বুখারি, ৪৬৮৬; সহিহ মুসলিম, ২৫৮৩

৮. সহিহ বুখারি, ১৩৯৫; সহিহ মুসলিম, ১৯

ওপর একটি ঘর নিয়ে মামলা করে। তখন সায়িদ বলেন, ঘর তাকে নিয়ে যেতে দাও। কারণ, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ যদি অন্যায়ভাবে কারও এক বিঘত জমিও ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কেয়ামতের দিন তার (গলায়) সাত স্তর জমিনের (বেড়ি পরিয়ে) দেওয়া হবে। তারপর সায়িদ বলেন, হে আল্লাহ, যদি সে মিথ্যা দাবি করে থাকে, তাহলে তাকে অন্ধ করে দেবেন আর সেই ঘরকেই তার কবর বানাবেন!

বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, এরপর আমি দেখেছি, ওই নারী অন্ধ হয়ে গেছে। তখন সে দেয়াল ধরে ধরে হাঁটত আর বলত, আমার ওপর সায়িদ ইবনে জায়েদের বদদুআ লেগে গেছে। তারপর একবার সে ঘরে পায়চারি করার সময় ঘরের ভেতরে অবস্থিত কুয়ার মধ্যে পড়ে যায় এবং সেখানেই তার কবর রচিত হয়।[৯]

দুই.

ইমাম যাহাবি রহ. আশ্চর্য এক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন,

> আমি এক লোককে দেখলাম, তার হাতগুলো কাঁধ থেকে কাটা। সে চিৎকার করে বলছিল, আমাকে দেখে শিক্ষা নাও, কারও ওপরে জুলুম করো না। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, ভাইজান, এসব বলার কারণ কী? সে বলল, আমার কাহিনি বড়ই অদ্ভুত। আমি ছিলাম জালেমদের সহযোগী। একদিন আমি এক মাছ শিকারির দেখা পাই, সে অনেক বড় একটি মাছ নিয়ে আসছিল। মাছটি দেখে আমার পছন্দ হয়ে যায়। আমি শিকারিকে বললাম, এটা আমায় দিয়ে যা। কিন্তু সে তা দিতে অস্বীকার করল। তখন আমি তাকে মেরে তার থেকে মাছটি ছিনিয়ে নিই।
>
> মাছটি ওঠানোর সময় তা আমার বৃদ্ধাঙ্গুলিতে খুব জোরে কামড় বসিয়ে দেয়। তারপর আমি ঘরে ফিরতে ফিরতে ওই কামড়ের ব্যথা মারাত্মক আকার ধারণ করে। আমি একটুও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। এমনকি ঘুমানোর জন্য চোখের পাতাও এক করতে পারছিলাম না। আমার হাত ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়।
>
> সকাল হলে আমি চিকিৎসকের কাছে গেলাম। চিকিৎসক বলল, এটা তো দেহে বাসা বাঁধতে থাকা অনেক বড় অসুখের আলামত! বাঁচতে

---

৯. সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها

চাইলে আপনার আঙুলটা কাটতে হবে, নাহয় গোটা হাতই কেটে ফেলে দেওয়া লাগতে পারে! অনন্যোপায় হয়ে আমার আঙুলটাই কাটতে হলো।

কিন্তু এরপরেও আমার রোগ গেল না। তখন চিকিৎসক আমাকে হাতটাও কেটে ফেলতে বলল। বাধ্য হয়ে হাতও কাটলাম। কিন্তু এরপরে কব্জি পর্যন্ত ব্যথা পৌঁছে গেল। ব্যথাও বাড়ল চূড়ান্ত সীমায়। এক দণ্ড স্বস্তি পাচ্ছিলাম না আমি। যন্ত্রণার কারণে চিৎকার করতে থাকলাম। তখন আমাকে কনুই থেকে কেটে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হলো। আমি তাই করলাম। কিন্তু কোনো উপকারই হলো না, বরং ব্যথা আরও বাড়তে বাড়তে ওপরের দিকে উঠতে থাকল। তখন আমাকে বলা হলো, কাঁধ পর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে, নাহয় ব্যথা গোটা দেহেই ছড়িয়ে পড়বে। উপায়ান্তর না দেখে আমাকে তাই করতে হলো।

এ পর্যায়ে কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আপনার এই অবস্থার উৎস কী? আমি তাকে ওই মাছের কাহিনি খুলে বললাম। তা শুনে সে আমায় বলল, আপনি যদি শুরুতেই ওই মাছওয়ালার কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতেন, তাহলে আপনার এক খণ্ড অঙ্গও কাটার প্রয়োজন হতো না। এখনো সময় আছে, আপনি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করুন! নাহয় এই বিষ সারা দেহেই ছড়িয়ে পড়বে।

তারপর আমি সারা শহরজুড়ে ওই লোককে খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে তার সন্ধান পেয়ে তাকে বললাম, আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিন। সে জানতে চাইল, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সেই ব্যক্তি, যে আপনার হাত থেকে মাছ ছিনিয়ে নিয়েছিল। তারপর আমার সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম এবং আমার হাতও তাকে দেখালাম। সে আমার অবস্থা দেখে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ভাই, আমি আপনাকে মাফ করে দিলাম।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যখন মাছ নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন কি আপনি বদদুআ করেছিলেন? সে বলল, হ্যাঁ, আমি তখন বলেছিলাম, হে আল্লাহ, এর ব্যাপারে কোনো ফয়সালা করে আপনি আপনার সক্ষমতা দেখান।

আসমা বিনতে আবু বকর রা.

তিনি হলেন হজরত আবু বকর রা.-এর মেয়ে। তার মা কুতাইলা বিনতে আবদুল উজ্জা।[৭৩] আসমার সাথে হজরত আয়েশা রা.-এর সম্পর্ক সৎবোনের। আয়েশার আম্মার নাম উম্মে রুমান। দুই বোনের মাঝে আসমা দশ বছরের বড় ছিলেন। আসমার জন্মের সময় পিতা আবু বকরের বয়স ছিল ২০ বছরের কিছু বেশি। তিনি ১৭ জন মানুষের পরে ইসলামগ্রহণ করেন।[৭৪]

হজরত আসমাকে 'জুন নিতাকাইন' বলে ডাকা হতো, যার অর্থ দুই কোমরবন্ধনীওয়ালা। হিজরতের দিন রাতে তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পিতা আবু বকর রা.-এর জন্য নাস্তা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেই নাস্তা পাঠানোর সময় দেখেন বাঁধার জন্য কিছু পাচ্ছেন না। তখন হাতের কাছে কোমরবন্ধনী খুঁজে পেলে পিতার কথা অনুযায়ী সেটাই দুই টুকরা করে একটি দিয়ে খাবারের পাত্র বাঁধেন, আরেকটি দিয়ে পানপাত্র বাঁধেন। তাই এরপরে তার নাম পড়ে যায় দুই কোমরবন্ধনীওয়ালা।[৭৫]

হজরত আসমা রা. হিজরতে বের হওয়ার সময় গর্ভবতী ছিলেন। তিনি কুবায় পৌঁছার পর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. জন্মগ্রহণ করেন। সদ্যজাত পুত্রকে মা আসমা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে তুলে দেন। তিনি একটি খেজুর চাইলেন, তারপর তা চিবিয়ে শিশু আবদুল্লাহর মুখে দিয়ে তাহনিক সম্পন্ন করলেন। এভাবে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের নিজের পেটে সর্বপ্রথম নববি লালা প্রবেশ করানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য আল্লাহর কাছে বরকতের দুআ করেন।

অতএব ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের পর সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করা শিশু হলো আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, যার জন্মদাত্রী আসমা বিনতে আবু বকর রা.।[৭৬] তা ছাড়া এ শিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে মুসলিম শিবিরে আনন্দের ঢল নামে। কারণ, এ

---

৭৩. তবাকাতুল কুবরা, ৮/৩৩০

৭৪. উসদুল গাবাহ, ৩/৭৫৪

৭৫. সহিহ বুখারি, ৩৯০৭

৭৬. প্রাগুক্ত, ৩৯১০

গুজব রটে গিয়েছিল যে, ইহুদিরা তোমাদের ওপর জাদু করেছে, তাই তোমাদের আর কখনো সন্তান হবে না।[৭৭]

হজরত আসমার বিয়ে হয়েছিল হজরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা.-এর সাথে, যিনি আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম সদস্য। তার ঔরসে হজরত আসমা আট সন্তান জন্মদান করেন।[৭৮]

হজরত আসমার স্বামীর ঘরে অনেক কঠিন কঠিন কাজ করতে হতো। একবার তিনি এর জন্য পিতা হজরত আবু বকরের কাছে অভিযোগ জানান। তখন তিনি বলেন, মেয়ে আমার, ধৈর্য ধরো। কারণ, কোনো নারী যদি নেক স্বামী লাভ করে, তারপর ওই স্বামী ইন্তেকাল করে আর স্ত্রী নতুন কোনো বিয়ে না বসে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনকে জান্নাতে একত্র করে দেবেন।[৭৯]

হজরত আসমা রা. একজন দানশীলা উদার মহিলা ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। যেমন একবার তিনি আসমাকে লক্ষ করে বলেন, (দানের) থলের মুখ বেঁধো না, তাহলে তোমার (রিজিকের) থলের মুখও বেঁধে দেওয়া হবে। অন্য বর্ণনায় হাদিসটি এ বাক্যে এসেছে যে, তুমি গুণে গুণে (দানসদকা) করতে যেয়ো না, তাহলে আল্লাহও (তোমার রিজিক) গুণে গুণে দেবেন।[৮০]

অতএব হজরত আসমা নিজের মেয়ে ও পরিবারের লোকদের উপদেশ দিয়ে বলতেন, তোমরা ব্যয় ও দানসদকা করতে থাকো, অর্থ জমা হওয়ার অপেক্ষায় বসে থেকো না। কারণ, যদি সে আশায় বসে থাকো, তাহলে বাড়তি অর্থ কখনোই জমাতে পারবে না। আর যদি সে চিন্তা না করে ব্যয় ও দান চালু রাখো, তাহলে তোমাদের হাত কখনোই বন্ধ হবে না।[৮১]

হজরত আসমার আম্মা কুতাইলা বিনতে উজ্জাকে হজরত আবু বকর জাহিলি জমানায় তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলাম আগমনের পরে একবার কুতাইলা তার মেয়ের কাছে ঘি ও (চামড়া দাবাগাত করার জন্য) গাছের ছাল নিয়ে আসেন।

---

৭৭. প্রাগুক্ত, ৫৪৬৯

৭৮. তবাকাতুল কুবরা, ৮/৩৩০

৭৯. প্রাগুক্ত, ৮/৩৩১

৮০. সহিহ বুখারি, ১৪৩৩

৮১. তবাকাতুল কুবরা, ৮/৩৩২

প্রথম পরিচ্ছদে

দেহব্যবসায় জবরদস্তি ও যৌন নিপীড়নের শিকার নারী সাহাবি

কিছু সাহাবি শিরোনামে উল্লেখিত বিষয়েরও শিকার হয়েছিলেন। এজন্য আমরা কুরআনে কারিমে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হতে দেখি,

وَ لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ مَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘তোমাদের বাঁদিরা যদি পবিত্র থাকতে চায়, তবে পার্থিব লাভের আশায় তোমরা তাদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর কেউ যদি তাদের এ কাজে বাধ্য করে, তাহলে তাদের বাধ্য করার পর (তারা ক্ষমার আশা রাখতে পারে। কেননা,) নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[১৯৬]

মাননীয় আরব আলেম শায়েখ আহমাদ জাদ লেখেন, জাহেলি যুগে রোজগারের পথ হিসেবে বাঁদিদের দিয়ে ব্যবসা করানো হতো। কিন্তু ইসলাম এসে এ কাজ হারাম ঘোষণা করে। মুসলিম সমাজের পবিত্রতা রক্ষার ভাবনায় ইসলাম এই আইনবিধান করে এবং উল্লিখিত আয়াত অবতরণের মধ্য দিয়ে এই নিকৃষ্ট কর্মের মূলোৎপাটন ঘটায়।

---

১৯৬. সুরা নুর, ৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদ
আপনজন বঞ্চিত নারী সাহাবি

উমামা বিনতে আবুল আস রা.

পিতা আবুল আস ইবনে রবি রা., মা নবিকন্যা জয়নব রা.। দেখা যেত, কখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামাজের মধ্যেই কোলে তুলে নিতেন। অবশ্য রুকু-সেজদার সময় নামিয়ে দিতেন।[২৬১]

একবার এক লোক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু হাদিয়া দেয়। এর মাঝে মুক্তার ইয়ামেনি একটি হারও ছিল। তখন তিনি বললেন, এটা আমি আমার পরিবারের এমন একজনকে দেব, যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তারপর তিনি উমামাকে ডাকলেন এবং হারটি তার গলায় পরিয়ে দিলেন। এ সময় উমামার চোখে কেতুর (চোখের ময়লা) লেগে ছিল, সেটা তিনি নিজ হাতে পরিষ্কার করে দিলেন। আরেক বর্ণনায় আছে, বাদশা নাজাশি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু স্বর্ণালংকার হাদিয়া পাঠান। তার মাঝে একটি সোনার আংটিও ছিল। নবিজি সেটা হাতে নিলেন এবং জয়নবের মেয়ে উমামাকে কাছে ডেকে বললেন, মেয়ে আমার, এটা পরে নাও।[২৬২]

হজরত ফাতেমার ইন্তেকালের পরে হজরত আলি উমামাকে বিয়ে করেন। তা ফাতেমারই অসিয়ত ছিল। হজরত উমরের শাসনকালে তিনি তাকে বিয়ে করেন।

---

২৬১. সুনানে আবু দাউদ, ৯১৭, ৯২০

২৬২. তবাকাতুল কুবরা, ৮/৩১৬; সুনানে আবু দাউদ, ৪২৩৫

উমামা বহুদিন তার সংসারে ছিলেন (প্রায় ২৫ বছর) এবং তার ঔরসে সন্তানও জন্ম দেন।[২৬৩]

তারপর হজরত আলি যখন আততায়ীর হাতে আহত হন, তখন মুগিরা ইবনে নওফলকে পরামর্শ দেন, তার মৃত্যুর পরে তিনি যেন উমামাকে বিয়ে করে নেন। অতএব ইদ্দত শেষ হলে তাদের বিয়ে হয় এবং মুগিরার ঔরসে তিনি ইয়াহয়া নামক সন্তানের জন্ম দেন। ইয়াহয়ার নামেই মুগিরাকে আবু ইয়াহয়া বা ইয়াহয়ার বাবা উপনামে ডাকা হতো। তারপর মুগিরার বিবাহাধীনেই উমামা ইন্তেকাল করেন। তখন হজরত মুয়াবিয়ার শাসনামল চলছিল। আর হজরত উমামার সূত্রে কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি।[২৬৪]

৪০ হিজরির সময় প্রায় ২৫ বছরের সংসার জীবনের ইতি ঘটিয়ে তার স্বামী হজরত আলি রা. আততায়ীর খঞ্জরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।[২৬৫] স্বামীর মৃত্যুতে উমামা ভীষণ আঘাত পান। তার বিধবা জীবনের প্রতি শোকপ্রকাশ করে উম্মে হাইসাম নাখায়িয়া নামক নারী শোকগাঁথা গেয়ে বলেন,

أَشَابَ ذَوَائِبِي وأذلَّ رُكنِي ... أُمامةٌ حِينَ فارَقتِ القَرِيناَ،

تَطيفُ به لِحَاجتِها إليه ... فَلمَّا استَيأَستْ رَفعَت رَنِينًا.

আমার চুল হলো সাদা, শক্তি হলো শেষ,
যবে উমামার হলো সাথিবিচ্ছেদ।
প্রয়োজনে মনে জাগত সাথির খেয়াল,
উঠল কান্নার ধ্বনি আধারে নিরাশার।

আম্মাজান উম্মে সালামা রা.

তার নাম হিন্দ। তিনি আবু উমাইয়া সুহাইল ইবনে মুগিরার কন্যা। মায়ের নাম আতিকা বিনতে আমের। প্রথমে উম্মে সালামার আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ রা.-এর সঙ্গে বিয়ে হয়।[২৬৬] উম্মে সালামা ছিলেন প্রথম যুগের

---

২৬৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৩৫; উসদুল গাবাহ, ৩/৭৬৪

২৬৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৩৫

২৬৫. আল-ইসাবাহ, ৪/২৩১; আল-ইসতিয়াব, ৪/৩৩৯

২৬৬. তবাকাতুল কুবরা, ৮/১১৫-১১৬

মুসলমান।[২৬৭] আবু সালামা তাকে হাবশার উভয় হিজরতেই সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে তাদের জয়নব নামক কন্যার জন্ম হয়। তারপর দুররা, মুসলিম ও উমর নামক সন্তানের জন্ম হয়। হজরত আবু সালামা হিজরতের চতুর্থ বর্ষের জুমাদাল উখরা মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি বদরি সাহাবি ছিলেন।[২৬৮] সাইফুল্লাহ হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. এবং আবু জাহেল ছিল উম্মে সালামার চাচাতো ভাই।[২৬৯]

আম্মাজান উম্মে সালামা রা. বলেন, আবু সালামার ইন্তেকালের পর আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, আমি কীভাবে দুআ করব? তিনি আমাকে দুআ শিখিয়ে দিয়ে বললেন,

وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى نَافِعَةً.لَهُ، اغْفِرْ اللَّهُمَّ

‘হে আল্লাহ, আমাকে ও তাকে ক্ষমা করুন, এবং তার পরিবর্তে আমাকে উত্তম বদলা দান করুন।’

আমি এই দুআ করি। তারপর আল্লাহ আমাকে আবু সালামার চেয়েও উত্তম বদলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (স্বামী হিসেবে) দান করেন।[২৭০]

চতুর্থ হিজরির শাওয়াল মাসের ২০ তারিখ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন এবং উক্ত মাসের কয়েক দিন বাকি থাকতেই তাকে ঘরে তুলে নেন। এই বিয়ের ব্যাপারে কেউ বলল, আরবের এক বিধবা নারী এশার শুরুর দিকে মুসলমানদের সর্দারের বউ হয়ে তার ঘরে গেল, আর শেষরাতেই সে আটা পিষা শুরু করল; তিনি হলেন উম্মে সালামা রা.।[২৭১]

উম্মুল মুমিনিন হজরত জয়নব বিনতে খুজাইমা রা., যিনি উম্মুল মাসাকিন বা মিসকিনদের আশ্রয় বলে পরিচিত ছিলেন, তার ইন্তেকালের পর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে উম্মে সালামাকে উঠান। উম্মে সালামা বলেন, ওই ঘরে আমি একটি পাত্র দেখতে পাই। ওখানে উঁকি দিয়ে দেখি, তার ভেতরে কিছু যব পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে একটি পেষণযন্ত্র আর কিছু হাড়িপাতিলও ছিল।

---

২৬৭. আল-ইসাবাহ, ৪/৪৩৯

২৬৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২০৬; মুসতাদরাকে হাকেম, ৪/১৬

২৬৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২০২

২৭০. সহিহ মুসলিম, كتاب الجنائز، ما يقال عند المريض

২৭১. মুসতাদরাকে হাকেম, ৪/১৮; তবাকাতুল কুবরা, ৮/১২৩

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, রব্বে কারিমের অনুগ্রহ এবং সাহায্যে বইটি পাঠকের জন্য উন্মুক্ত করার উপযুক্ত হয়েছে। অনুবাদ করার ক্ষেত্রে বইয়ের ভাষা সহজবোধ্য এবং সাবলীল করতে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। বইটিতে আলোচিত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাত বরণের হৃদয়বিদারক সব ঘটনা। নবি-রাসুলগণের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনায় কুরআন-হাদিস সুশোভিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

> মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আমার যুগের লোকেরা। তারপর তাদের পরবর্তী যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ।

এই হাদিসে 'আমার যুগের লোকেরা' মানে হলো সাহাবায়ে কেরাম। আল্লাহ তাআলার এই দ্বীন আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমানত মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং ইসলাম নামের এই ছায়াবৃক্ষের বীজ মানুষের অন্তরে বপন করার জন্য তারা অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, জিহাদ করেছেন, শাহাদাত বরণ করেছেন।

শহিদ সাহাবিগণের শাহাদাত বরণের সেই বর্ণনাগুলোই ওঠে এসেছে এই বইয়ে। আমি নিশ্চিত, এই বই পড়ার সময় পাঠকের চোখ বারবার ভিজে ওঠবে। দ্বীনের জন্য সাহাবায়ে কেরামের ত্যাগ ও ভালোবাসায় পাঠকের হৃদয় সিক্ত হবে। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অদ্ভুত রকম ভালবাসা তৈরি হবে এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা মনের ভেতর জাগ্রত হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটি প্রকাশে উদ্যোগ নেওয়ায় অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রকাশক আশিকুর রহমান ভাইকে। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে নিঃসংকোচে আমাদেরকে জানাবেন এবং এই বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সম্পৃক্ত সবাইকে দুআয় স্মরণ রাখবেন।

—মিনারুল ইসলাম
জামিয়া মাহমুদিয়া ইসহাকিয়া
মানিকনগর, ঢাকা-১২০৩

সম্পাদকের কথা

‘শাহাদাত’ প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে লালিত একটি স্বপ্ন। সত্যিকারের মুসলিমরা মহান রবের মনোনিত দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনের মায়া-মোহ ত্যাগ করে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেন। শরীরের তাজা রক্ত বিলিয়ে দেন মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য। শাহাদাতের শরাব পান করেন পরম তৃপ্তির সঙ্গে। সাহাবায়ে কেরাম সেই সৌভাগ্যবান মানুষ, যাদের রক্তের বিনিময়ে ইসলাম আজ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাদের বুক চিরে ঝরেছে রক্ত, কিন্তু সেই রক্তে সিক্ত হয়েছে ঈমানের বাগান; তাদের প্রাণ নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু সেই প্রাণ দিয়েই সঞ্জীবিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাস।

‘সাহাবিদের শাহাদাত বরণ’ চমৎকার একটি বই। এতে তুলে ধরা হয়েছে সেই বীর সাহাবিদের গৌরবময় কাহিনি, যারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থেকে সত্যের পতাকা রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। যাদের পিছু হটার সময় গোড়ালি রক্তাক্ত হয়নি; বরং সামনের দিকে এগোতে গিয়েই বুক ফেটে রক্ত ঝরেছে, আর সেই রক্তেই রঞ্জিত হয়েছে তাদের পদযুগল। তারা ছিলেন সাহসের প্রতীক, ঈমানের অগ্নিশিখা এবং আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তাদের প্রতিটি শাহাদাতের ঘটনা শুধু একটি ইতিহাস নয়, বর একেকটি আলোক শিখা—যা আমাদের ভেতর ঈমানের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, দুনিয়ার মায়া থেকে দূরে সরিয়ে আখেরাতের পথে ডেকে আনে।

আমাদের আশা, এ বইটি শুধু তথ্যের ভাণ্ডার হয়ে থাকবে না; বরং পাঠকের অন্তরে জাগিয়ে তুলবে সাহাবিদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, তাদের মতো বাঁচার অনুপ্রেরণা, আর মৃত্যুর পর শাহাদাতের মহান আকাঙ্ক্ষা।

আমরা কৃতজ্ঞ সেই শহিদ সাহাবিদের প্রতি, যাদের স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে আজ ইসলাম টিকে আছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকেও তাদের পথের অনুসারী বানান।

— মাহমুদুল্লাহ মুহিব
(সম্পাদক)

সূচিপত্র

শহিদের প্রকারভেদ	১৭
শহিদী মৃত্যু কামনায় দুআ	১৮
শহিদী মৃত্যু লাভের আমল	১৯
শাহাদাতের ইচ্ছা না থাকার ক্ষতি	১৯
জিহাদের আকাঙ্ক্ষা করো	১৯
অন্য আরেক দৃষ্টিতে শহিদের প্রকার	২০
যারা শহিদের মর্যাদা পাবেন	২১
শহিদের কাফন	২৩
শহিদের জানাজা	২৩
শহিদের পুরস্কার	২৪
ইসলামে প্রথম তরবারি	২৫
ইসলামের প্রথম শহিদা সুমাইয়া রা.	২৬
উমর রা.	২৮
উসমান বিন আফফান রা.	৩১
আলি রা.	৩৯
সাইয়িদুশ-শুহাদা হামজা রা.	৪১
আবু দাহদাহ রা.	৪৮
উয়াইস আল-কারনি রাহ.	৪৯
আকরা বিন হাবিস রা.	৫০
আবু কায়েস বিন হারেস রা.	৫১
উম্মে ওয়ারাকা বিনতে আবদুল্লাহ রা.	৫২
আবু জায়েদ রা.	৫৩
আবু আমরাহ রা.	৫৪

আবান বিন সায়িদ আল কুরাইশি রা. ৫৭
হজরত আনাস বিন নাযার রা. ৫৯
এক আনসারি সাহাবি রা.-এর শহিদ হওয়ার ঘটনা ৬১
সাতজন আনসারি সাহাবি রা.-এর শাহাদাত ৬১
আবু সুফিয়ান বিন হারেস রা. ৬৩
হজরত বাশির বিন মুআবিয়া রা. ৬৫
তায়েফের বারোজন শহিদ ৬৭
সাবিত বিন কায়েস রা. ৬৮
সুমামা বিন উছাল রা. ৭১
সাবিত বিন দাহদাহ রা. ৭৫
হজরত জুলাইবিব রা. ৭৭
মুতা যুদ্ধ ও তিন সেনাপতির শাহাদাত ৭৯
জুনদুব ইবনে আমির রা.-এর বীরত্ব ও শাহাদাত ৮৩
সাইয়িদুনা হুসাইন রা. ৮৪
হানজালা রা. ১০৩
হারেসা বিন সুরাকা আনসারি রা. ১০৫
৭০ জন হাফেজ সাহাবির শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা ১০৬
হারেস বিন আবি হালাহ রা. ১১১
হজরত হুসাইল বিন ইয়ামান রা. ১১৩
হজরত খুনাইস বিন হুজাফা রা. ১১৪
খাইসামা ও তার ছেলে সাদ রা.-এর ঘটনা ১১৫
খাইসামা বিন হারেস রা. ১১৬
খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস রা. ১১৭
খুবাইব বিন আদি, আসেম বিন সাবিত ও আবদুল্লাহ বিন উনাইস রা. ১১৮
আসেম বিন সাবিত রা. ১২০
খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ১২২
খানসা রা. ও তার চার ছেলের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ১২৫
হারেস বিন সুম্মাহ রা. ১২৭
হাকিম বিন কাইসান রা. ১২৯
হারেস ইবনে হিশাম রা. ১৩০
হাবিব বিন জায়েদ আনসারি রা. ১৩১
খারিজা ইবনে জায়েদ আবি জুহাইর রা. ১৩৩
খুজাইমা বিন সাবিত রা. ১৩৪

খাল্লাদ বিন সুওয়াইদ রা. ১৩৬
জাকওয়ান বিন আবদে কায়েস আনসারি রা. ১৩৭
যুশ-শিমালাইন বিন আবদু আমর আল-মুহাজিরি রা. ১৩৮
ইবনে রাওয়াহা রা. ১৩৮
রাফে ইবনে মালিক রা. ১৪৩
ইবনে জুবাইর রা. ১৪৩
জুবাইর ইবনে আওয়াম রা. ১৪৭
জুহাইর বিন কায়েস আল বালাউই রা. ১৫০
জায়েদ বিন খাত্তাব রা. ১৫১
উমাইর রা. ১৫৩
সাদ বিন রাবি আনসারি রা. ১৫৪
সুহাইল বিন আমর রা. ১৫৫
সুলাইত বিন আমর রা. ১৫৭
সালমা বিন হিশাম রা. ১৫৮
শাম্মাস বিন উসমান রা. ১৫৯
এক সাহাবির শহাদাতের ঘটনা ১৬০
সাফওয়ান বিন বাইদা রা. ১৬১
তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা. ১৬১
আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. ১৬২
হজরত ইকরিমা ইবনে আবু জাহেল রা. ১৬৩
তিন সাহাবির বিস্ময়কর ঘটনা ১৬৫
উকবা বিন নাফে রা. ১৬৫
উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস রা. ১৬৬
আমর ইবনে জামুহ রা. ১৬৮
আবদুল্লাহ বিন জায়েদ বিন আসেম রা. ১৭০
আবদুল্লাহ বিন সুহাইল বিন আমর রা. ১৭২
আমের বিন ফুহাইরা রা. ১৭৪
আমির বিন তুফাইল রা. ১৭৬
আবদুল্লাহ ইবনে মাখরমা রা. ১৭৮
আবদুল্লাহ বিন আতিক রা. ১৭৯
আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাদলাহ রা. ১৮১
উমাইর ইবনে হুম্মাম রা. ১৮২
আউফ রা. ১৮৩

আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রা. ১৮৩
উক্কাশা রা. ১৮৫
আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম রা. ১৮৮
আমর বিন সাবিত ওরফে আসিরাম রা. ১৯১
আমর বিন উম্মে মাকতুম রা. ১৯২
আম্মার বিন ইয়াসির রা. ১৯৩
আবু দুজানা রা. ১৯৯
আবু আমরাহ রা. ২০০
খুনাইস ও আবদুল্লাহ রা.-এর দৃঢ়তা ২০১
আমির বিন আকওয়া রা. ২০৩
আব্বাদ বিন বিশর রা. ২০৫
আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল রা. ২০৭
কৃষ্ণাঙ্গ এক হাবশি গোলাম রা. ২০৭
ফিরাস বিন নাযার রা. ২০৮
মুসআব বিন উমাইর রা. ২০৯
মুরসাদ রা.-এর শাহাদাত ২১০
মালিক বিন সিনান খুদরি রা. ২১১
মাজাযাআ বিন সাওর সাদুসি রা. ২১১
মুআওয়াজ ইবনে আফরা রা. ২১৪
মুআজ ইবনে জাবাল রা. ২১৫
মুবাশ্বির বিন আবদুল মুনজির এবং আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম রা. ২১৬
মুজাযযার বিন জিয়াদ রা. ২১৭
মাআন বিন আদি রা. ২১৮
মুখাইরিক রা. ২১৯
মুসলিম বিন আওসাজাহ রা. ২২০
মাসউদ বিন হারেসা এবং আনাস বিন হিলাল আসমারি রা. ২২১
মুসান্না ইবনে হারেসাহ আশ-শাইবানি রা. ২২২
মুহাশশিম বিন উতবা ওরফে আবু হুজাইফা রা. ২২৫
নুআইম আন-নুহাম রা. ২২৬
নুআইম বিন আবদুল্লাহ রা. ২২৭
নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুজানি রা. ২২৯
তিনজন অজ্ঞাতনামা সাহাবি রা. ২৩২

দুজন অজ্ঞাতনামা সাহাবি রা. ২৩৩
নুমান বিন কাওকাল রা. ২৩৪
ওয়াহাব বিন কাবুস রা. ২৩৫
ওয়াহাব বিন সাদ রা. ২৩৬
ইয়াহইয়া ইবনে জায়েদ রা. ২৩৭
ইয়াজিদ বিন যুমআহ রা. ২৩৮

শহিদের প্রকারভেদ

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শহিদ পাঁচ প্রকার: ১. যিনি মহামারীতে মারা গিয়েছেন। ২. যিনি পেটের রোগে মারা গিয়েছেন। ৩. যিনি পানিতে ডুবে মারা গিয়েছেন। ৪. যিনি কোনো কিছুর নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন। ৫. যিনি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন।[১]

শহিদের ধরন তিনটি

১. দুনিয়া ও আখেরাত, উভয় দিক থেকে শহিদ

তিনি হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শহিদ হয়েছেন।

২. কেবল আখেরাতের দিক থেকে শহিদ

তিনি হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে শহিদ নন, কিন্তু আখেরাতে শহিদের মর্যাদা লাভ করবেন। এক হাদিসে এসেছে—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কাকে শহিদ মনে করো?' সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, যিনি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে মারা গিয়েছেন, তাকেই আমরা শহিদ মনে করি।' তিনি বললেন, 'তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহিদের সংখ্যা খুব কম হবে!' এরপর তিনি বললেন—

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, সে শহিদ।
যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায়, সে শহিদ।
যে ব্যক্তি পেটের রোগে মারা যায়, সে শহিদ।
যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যায়, সে শহিদ।
যে ব্যক্তি কোনো স্থাপনার নিচে চাপা পড়ে দুর্ঘটনায় মারা যায়, সে শহিদ।

---

১. সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।

এমনকি যে নারী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়, তিনিও শহিদ।[২]
এই ধরনের শহিদগণকে বলা হয়, আখেরাতের শহিদ। দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে তারা শহিদ নন। কারণ তাদেরকে গোসল দেওয়া হয়, কাফন পরানো হয়। তবে আল্লাহর কাছে শহিদদের তালিকায় তাদের নাম লেখা থাকবে।

৩. মানুষের চোখে শহিদ, আল্লাহর কাছে নয়

তারা এমন কিছু লোক যাদেরকে মানুষ শহিদ মনে করে, শহিদ বলে ডাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে তারা শহিদদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (নাউজুবিল্লাহ)। এর কারণ হতে পারে—তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করেননি, বরং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জীবন দিয়েছেন। যেমন—জাতির সামনে সম্মান অর্জন, বীরত্ব প্রদর্শন, নাম কামানো ইত্যাদি।

আমরা কারও অন্তরের খবর জানি না, তাই তাদের জন্য শহিদদের মতোই কাফন ও দাফনের বিধান পালন করব। কিন্তু আল্লাহ অন্তরের খবর জানেন এবং শুধু বাইরের আবরণ দেখে মূল্যায়ন করেন না। যারা শুধুমাত্র লোক দেখানো বা অন্য উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে মারা যায়, তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে শহিদ নন। এমনকি যদি তারা মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার সময় নিহত হয়, তবুও একই বিধান প্রযোজ্য।

একজন মুমিনের উচিত, সব সময় শহিদী মৃত্যু কামনা করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শহিদের মর্যাদা দান করুন এবং শহিদদের সঙ্গে মিলিত করুন। (আমিন)।

শহিদী মৃত্যু কামনায় দুআ

হজরত উমর রা. দুআ করতেন—'হে আল্লাহ, আমাকে শহিদের মৃত্যু দান করো এবং তোমার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহরে মৃত্যু দাও।'

আবার তিনি নিজেই বলতেন—'এই দুটো বিষয় কীভাবে একসাথে হবে! হে উমর, তুমি শহিদের মৃত্যু চাচ্ছ, আবার মদিনায় মৃত্যুবরণের ইচ্ছে পোষণ করছ! জিহাদ তো বাইরে হয়, মদিনায় শহিদ হওয়া কীভাবে সম্ভব!' তিনি নিজেই এর উত্তর দিতেন যে, যদি আল্লাহ চান, তাহলে এই দুটো একসাথে একত্রিত করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা তার এই দুআ কবুল করেছিলেন—তাকে শহিদও বানিয়েছিলেন এবং মদিনাতেই তার মৃত্যু দিয়েছিলেন।

---

২. মিশকাতুল মাসাবিহ।

শহিদী মৃত্যু লাভের আমল

এক হাদিসে এসেছে—যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২৫ বার এই দুআটি পাঠ করবে—

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ

হে আল্লাহ, আমার জন্য মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে বরকত দান করুন।

এই দুআর কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে শহিদের মৃত্যু দান করবেন এবং শহিদদের তালিকায় তার নাম লিখে দেবেন; যদিও বিছানায় তার মৃত্যু হয়।

এই আমল কঠিন কোনো আমল নয়, তবে শর্ত হলো, ইচ্ছা থাকতে হবে, চাইতে হবে। যদি ইচ্ছাই না থাকে, তাহলে তো সম্ভব না!

শাহাদাতের ইচ্ছা না থাকার ক্ষতি

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

যে ব্যক্তি কখনো জিহাদে অংশ নেয়নি এবং তার অন্তরে কোনোদিন জিহাদের ইচ্ছাও জাগেনি, সে একরকম মুনাফিকের মতো মৃত্যু বরণ করল।[৩]

জিহাদের আকাঙ্ক্ষা করো

জিহাদের আকাঙ্ক্ষা আগে মনের মধ্যে তৈরি করো। আল্লাহর কাছে চাও। তাহলে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগবে। কে জানে, হয়ত আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়ার চাঁদর বিছিয়ে আমাদের জন্যও শহিদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন।

---

৩. মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৩১

অন্য আরেক দৃষ্টিতে শহিদের প্রকার

পূর্বে বর্ণিত হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, শহিদ দুই ধরনের হয়ে থাকে।

১. পরিপূর্ণ শহিদ।

২. অপূর্ণ শহিদ বা হুকমি শহিদ।

পরিপূর্ণ শহিদ

পরিপূর্ণ শহিদ ওই ব্যক্তি, যে যুদ্ধের ময়দানে এমন অবস্থায় নিহত হয় যে, তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকে এবং আহত হওয়ার পর সে দুনিয়ার কোনো ভোগ-বিলাস গ্রহণ করেনি এবং ঔষধ বা অন্য কোনো জিনিস থেকে কোনোভাবে উপকৃত হয়নি।

এমনভাবে কেউ শহিদ হলে তার বিধান হলো—তাকে গোসল দেওয়া হবে না, তবে জানাজার নামাজ পড়া হবে। এটা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত। আর ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, এমন শহিদকে গোসলও দেওয়া হবে না, জানাজাও পড়া হবে না।

হুকমি শহিদ

এই প্রকারের শহিদগণ শাহাদাতের সওয়াব ও মর্যাদা পেয়ে যাবেন। তবে তাদেরকে সাধারণ মৃত মানুষদের মতো গোসল, কাফন ইত্যাদি দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে সব ইমামের একই অভিমত।

উপরে বর্ণিত হাদিসে এই ধরনের হুকমি শহিদদের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্লেগ বা সংক্রামক রোগে মৃত্যু হওয়া, পেটের রোগে মৃত্যু হওয়া, দালান বা পাহাড় ধ্বসে তার নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হওয়া—এই সবগুলোই হুকমি শহিদের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে হুকমি শহিদ হিসেবে চার প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা সুয়ুতি রহ. হুকমি শহিদের প্রায় ৩৮ টি প্রকার উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কম, কেউ বেশি সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।

যারা শহিদের মর্যাদা পাবেন

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ.-এর মতে ৩৮ প্রকার ব্যক্তি শহিদের হুকুমপ্রাপ্ত হবেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন:

১. যিনি পেটের রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

২. যিনি পানিতে ডুবে মারা গিয়েছেন।

৩. যিনি দালান বা কোনো কিছু ধ্বসে তার নিচে চাপা পড়ে যিনি মারা গিয়েছেন।

৪. যিনি বুকের ভেতর ফুসফুস বা পাঁজরে অসহনীয় ব্যথা বা ক্ষত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৫. যিনি যক্ষ্মা রোগে মারা গিয়েছেন।

৬. সফরে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

৭. মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

৮. গর্ভাবস্থায় মৃত্যুবরণ করা মহিলা।

৯. জীবন, সম্পদ বা ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করার জন্য লড়াই করে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

১০. যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

১১. পবিত্র ভালোবাসা, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি ভালোবাসায় মৃত্যু (যদি হারাম প্রেমে মারা যায়, তাহলে গুনাহগার হবে)।

১২. কুষ্ঠরোগ বা জটিল চর্মরোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

১৩. হিংস্র জন্তুর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি ।

১৪. কোনো জালেম বাদশাহর হাতে নিহত হওয়ার ভয়ে লুকিয়ে থেকে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

১৫. বিষাক্ত বা ক্ষতিকর প্রাণীর (যেমন,সাপ) কামড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

১৬. ইলমে দ্বীন শেখার উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শেখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

১৭. যিনি নিঃস্বার্থভাবে আজান দিতেন, শুধু সওয়াবের নিয়তে, কোনো বেতন নিতেন না, এমন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেও শহিদের মর্যাদা পাবেন।

১৮. সত্যবাদী ব্যবসায়ী।

১৯. যিনি পরিবার-পরিজনের জন্য হালাল রিজিকের সন্ধানে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন

২০. সমুদ্রযাত্রায় বমি ও মাথা ঘোরায় কষ্ট পেয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

২১. প্রতিদিন ২৫ বার এই দোআ পাঠকারী ব্যক্তি—

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

'হে আল্লাহ, আমাকে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বরকত দান করো।'

২২. নিয়মিত চাশতের নামাজের আমলকারী ব্যক্তি এবং যিনি প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখতেন, আর যিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ও সফর অবস্থায় যেখানেই থাকতেন, নামাজ ছাড়তেন না এমন ব্যক্তি।

২৩. যখন উম্মতের মধ্যে ফিতনা বা বিভ্রান্তি দেখা দেবে, তখন সুন্নাহর ওপর অটল থাকা ব্যক্তি।

২৪. যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় নিচের দোআটি চারবার পড়ে এবং ওই অসুস্থতাতেই মৃত্যুবরণ করে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।'

২৫. যে ব্যক্তি প্রতিরাতে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করে।

২৬. যে ব্যক্তি প্রতিদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর একশতবার দরুদ পাঠ করে।

২৭. যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শহিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে ।

২৮. যে ব্যক্তি জুমার দিন মৃত্যুবরণ করে।

২৯. যে ব্যক্তি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সীমান্তে ঘোড়া বেঁধে রাখে

৩০. যে ব্যক্তি যানবাহন থেকে পড়ে মারা যায়।

৩১. যে ব্যক্তি প্লেগ বা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

৩২. যে ব্যক্তি আগুনে পুড়ে মারা যায়।

৩৩. যে নারী বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়, অথবা নিফাস (প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব) শেষ হওয়ার আগেই মারা যায়।[৪]

৪. রওজাতুস সালেহিন।

শহিদের কাফন

শহিদের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান হলো, তাকে তার শাহাদাতের সময় পরিহিত কাপড়েই দাফন করা হয়। নতুন কাফন পরানো হয় না। যদিও সাধারণ মৃত মানুষকে সেলাই করা কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয় না, তবে শহিদের জন্য তার এই সেলাই করা পরিহিত পোশাকটাই কাফন হিসেবে গণ্য হয়।

তবে যদি অতিরিক্ত কাপড় পরা থাকে, যেমন শীতকালে কারো গায়ে যদি ভারী পোশাক বা মোটা চাদর কিংবা অতিরিক্ত কাপড় পরা থাকে—যেমন, জ্যাকেট বা কোট ইত্যাদি—তাহলে সেটা খুলে ফেলা হবে। প্রয়োজন হলে উপরে একটি চাদর দিয়ে ঢাকা যাবে, কিন্তু কাফনের জন্য প্রচলিত তিন কাপড় দেওয়া হবে না। হাদিসে এসেছে

وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم

তাদেরকে দাফন করা হবে রক্ত এবং পোশাকসহ।[৫]

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

> যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়েছেন, কেয়ামতের দিন তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবেন যে, তার শরীরে যেখানে যখম হয়েছিল সেখান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। যদিও তা দেখতে রক্তের মতো হবে, কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে মেশকের মতো মোহনীয়।[৬]

শহিদের জানাজা

শহিদের জানাজার নামাজ পড়া হবে। তবে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, শহিদের জানাজা পড়তে হবে না; তোমরা তাকে এভাবেই দাফন করে দাও। কারণ সে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গেছে; তার জন্য আর শাফায়াতের (সুপারিশের) প্রয়োজন নেই। কেননা হাদিসে এসেছে—

---

৫. মিশকাত

৬. মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৩০

السَّيْفُ مَحَاءٌ لِلْخَطَايَا

তরবারি (শহিদ হওয়া) গুনাহগুলোকে মুছে দেয়।[৭]

অর্থাৎ কাফেরের তরবারির আঘাতটাই তার জন্য শাফায়াত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এমনকি হাদিসে এসেছে, শহিদের রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। শহিদের সাথে কবরের সওয়াল-জওয়াবও হয় না। অথচ শহিদ ছাড়া প্রতিটি মৃত ব্যক্তিরই এই সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হতে হয়।

তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, 'শহিদের জানাজা পড়া হবে।' এটা একটি দীর্ঘ ফিকহি আলোচনা, এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা অসমীচীন। তবে মূল কথা হলো, শহিদগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সম্মানজনক মৃত্যু উপহার হিসেবে পেয়েছেন, যাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শ্রেষ্ঠতম মৃত্যু' ঘোষণা করেছেন।[৮]

শহিদের পুরস্কার

হজরত মিকদাদ ইবনে মাদি কারুবা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—আল্লাহ তাআলা শহিদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন

১. রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার আগেই তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং তাকে জান্নাতে তার স্থান দেখিয়ে দেওয়া হয়।
২. তাকে কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।
৩. কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে যে ভয়াবহ আতঙ্ক থাকবে, তা থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হবে।
৪. তার মাথায় এমন একটি মুকুট পরানো হবে, যার কেবল একটি মুক্তা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত কিছু থেকেও উত্তম।
৫. ৭২ জন হুরকে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়।
৬. তার আত্মীয়দের মধ্যে ৭০ জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।[৯]

৭. কানজুল উম্মাল, ৩৯৬৮৮
৮. ইসলাহি মাওয়ায়েজ
৯. তিরমিজি